জমজম ম্যাগাজিন



ফ্রী বিতরণের জন্য বিক্রয় নিষিদ্ধ

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة، ١٤٣٨ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة

زمزم – باللغة البنغالية / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بجنوب مكة – مكة المكرمة ، ١٤٣٨ هـ

٧٦ ص ؛ ١٧ X ٢٤ سم

ردمك: ٢-١-٩٠٩٥٧-٦٠٣-٩٧٨

١-الوعظ والإرشاد أ العنوان

ديوي ٢١٣ ١٤٣٨/٧٣١٦

رقم الإيداع: ١٤٣٨/٧٣١٣

ردمك: ٢-١-٩٠٩٥٧-٦٠٣-٩٧٨







zamzam.mk@Gmail.com www.zamzam-makkah.com ٠٠٩٦٦ ٥٥٥٢٦٤٦٠٤

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة

ذكرى

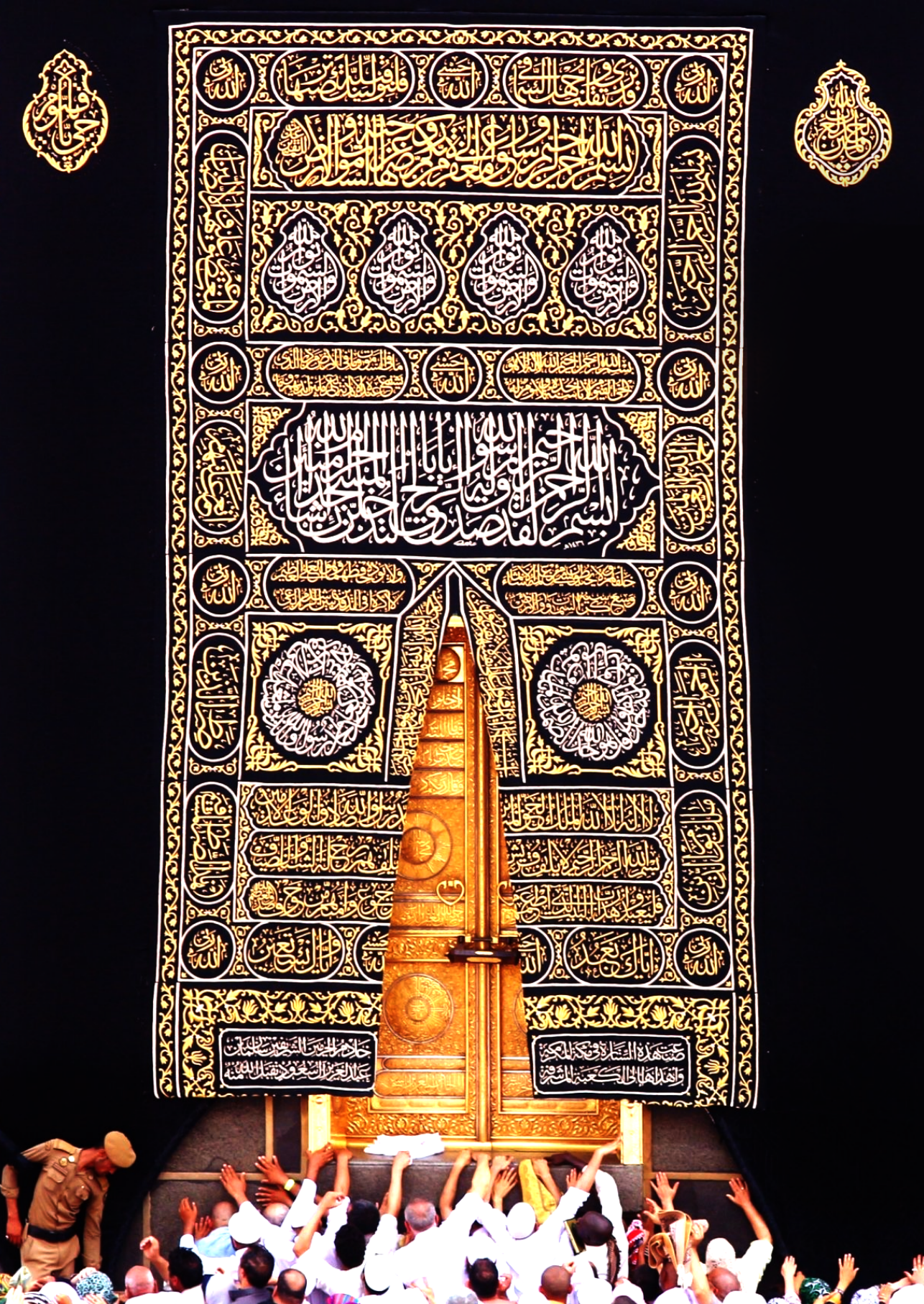
مكة المكرمة - حي السبهاني مقابل جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه

٠٠٩٦٦ ٥٥٥٢٦٤٦٠٤ ٠٠٩٦٦ ٥٣٤١١١٢٧٢

١٢٥٤٠٥٣٧١ www.dawahsmakkah.net

সূচীপত্র

ভূমিকা	5	المقدمة
কালিমায়ে শাহাদাত: গুরুত্ব ও তাৎপর্য	6	الشهادتان
কবীরা গুনাহ	13	الذنب الأعظم
যাদু ও ভাগ্য গণনা	20	السحر والكهانة والعرافة
প্রিয় নবী ﷺ কে জানুন	24	تعرف على نبيك ﷺ
সালাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা	36	أهمية الصلاة في الإسلام
আবার সালাত আদায় করো, তোমার সালাত হয় নি	40	ارجعْ فصلّ فإنك لم تصل
হিদায়াতের আলোকরশ্মি	43	نور الهداية
কল্যাণকর কাজে উদ্বুদ্ধকারী কিছু হাদীস	45	المحفزات إلى عمل الخيرات
যাদের জন্য জান্নাতের বাড়ি বরাদ্দ	49	هاك بيتا في الجنة
সাহাবীগণের মর্যাদা	52	فضل الصحابة
বিশ্বমানবতার প্রতি মহানবীর ১০ অবদান	59	١٠ إضاءات حول ما قدّمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم
সূরা আসর আমাদের যা শেখায়	62	دروس مستفادة من سورة العصر
উত্তম চরিত্র অবলম্বনের উপায় ও উপকারিতা	69	وسائل الالتزام بالأخلاق الحسنة وفوائدها
আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়	73	شكر نعمة الله
তাওবাহ	75	التوبة



ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি যিনি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন ও তাঁর পরিবার পরিজন আত্মীয়-স্বজন ও সকল সাহাবাগণের প্রতি।

সম্মানিত পাঠক! নতুন আঙ্গিকে, নতুন প্রচ্ছদে **'জমজম ইসলামী ম্যাগাজিন'** বাংলা ভাষায় পুনরায় আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। যাতে রয়েছে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ও সালফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও বিজ্ঞ ইমামগণের উদ্ধৃতি সম্বলিত ইসলামিক প্রবন্ধ ও রচনাবলী।

এ ম্যাগাজিন পাঠের মাধ্যমে শরীয়তের এমন অনেক বিষয় অবগত হতে পারবেন যাতে দ্বীনের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর নিকট দুআ করছি, এ ম্যাগাজিন যেন আমাদের সকলের জন্য উপকারী হয়, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম হয় এবং পরকালের পাথেয় হয়। আল্লাহ সকল উত্তম কাজের সহায়তাকারী।

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

বিনীত,

ইসলামিক দাওয়াহ সেন্টার, দক্ষিণ

মক্কা শরীফ



কালিমায়ে শাহাদাত

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করে আমাদের হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে অনেক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, যাঁর হাত ধরে অসংখ্য মানুষ সৃষ্টির ইবাদত ও পূজা ছেড়ে স্রষ্টার ইবাদতের দিশা পেয়ে ধন্য হয়েছে। সেই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবার, সাথীবর্গ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সঠিক অনুসরণকারীদের উপর।

নিঃসন্দেহে কালিমায়ে শাহাদাত ছাড়া কোন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না। তাই এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর প্রথম ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [مُحَمَّد : ١٩]

"জেনে নাও আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই"
[সূরা মুহাম্মদ ১৯]

কালিমায়ে শাহাদাত হল ইসলামের প্রথম রুকন। তাই এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা আমরা পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি।

প্রথমতঃ কালিমায়ে শাহাদাত বা শাহাদাতাইনের অর্থঃ

১- শাহাদাতু 'আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থঃ

এ কথা বিশ্বাস করা ও সাক্ষ্য দেয়া যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের হক্বদার নয়। অতএব, 'লা-ইলাহা' বাক্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের ইবাদতের হক্বদার হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। 'ইল্লাল্লাহ' শব্দে একমাত্র আল্লাহই সকল ইবাদতের হক্বদার তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সঠিক অর্থ হলোঃ আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ বা ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই।

কালিমায়ে শাহাদাতের অনেক বাতিল ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন-

ক- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ হলঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। এ অর্থ সঠিক নয়। কেননা এতে বিভ্রম হতে পারে, পৃথিবীতে মিথ্যা ও মনগড়া যে সকল উপাস্য ও প্রতিমা আছে সেগুলোও নেই। বাস্তবতা তা নয়, বরং সে জাতীয় অসংখ্য বানোয়াট উপাস্য আছে। যেগুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কেননা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সত্য মাবূদ।

খ- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ হলঃ আল্লাহ ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই। এটি কালিমার অর্থের অংশ বিশেষ। কালিমা দিয়ে শুধু এ উদ্দেশ্য করা হয়নি। কারণ, এর মাধ্যমে শুধু তাওহীদে রুবূবিয়্যাহকে

সাব্যস্ত করা হয়। শুধু তাওহীদে রুবূবিয়্যাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যথেষ্ট নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের মুশরিকরা এ প্রকার তাওহীদকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তাদেরকে মুমিন বলে গণ্য করা হয়নি।

গ- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ হলঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বিধান মানা যাবে না। এটাও এ কালিমার অর্থের অংশ বিশেষ। এ কালিমা দিয়ে শুধু এটাই উদ্দেশ্য নয় এবং মুমিন হওয়ার জন্য তা যথেষ্টও নয়। কারণ, কেউ যদি বিধানদাতা হিসেবে এক মাত্র আল্লাহকেই মানে, সাথে অন্য কারো কাছে দোআ করে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য সামান্য ইবাদতও করে তবে সে মুওহহিদ বা একত্ববাদী থাকবে না। উপযুক্ত ব্যাখ্যাগুলো ভুল অথবা অপূর্ণ। প্রচলিত কিছু বইয়ে এসকল ভুল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বলে আমরা জনগণকে সতর্ক করছি। সাল্‌ফে সালিহীন এবং গবেষকগণের নিকটে এ কালিমার সঠিক অর্থ হলোঃ (আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ বা ইবাদতের উপযুক্ত কেই নেই)।

২- শাহাদাতু 'আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' এর অর্থঃ (মনে মনে ও উচ্চারণে) এ সাক্ষ্য দেয়া যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল। (সে সাথে সাক্ষ্যের দাবী অনুযায়ী আমল করা। যথা- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আদিষ্ট বিষয়ের আনুগত্য করা। তিনি যে বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে মেনে নেয়া, তিনি যে সকল জিনিস থেকে নিষেধ বা সতর্ক করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর দেখানো পথ ব্যতীত আল্লাহর ইবাদত না করা।)

দ্বিতীয়ত ঃ শাহাদাতাইনের রোকনসমূহঃ

ক- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ঃ এর দু'টি রোকন রয়েছে, না বাচক এবং হ্যাঁ বাচক। প্রথম রোকন নাফী বা না বাচক। আর তা হলো 'লা ইলাহা' এটি আল্লাহর সাথে সকল প্রকার শিরক বা অংশীদারিত্বকে বাতিল করতঃ আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা করা হয় তা অস্বীকার করা ওয়াজিব বা আবশ্যক করে। দ্বিতীয় রোকন ইসবাত বা হ্যাঁ বাচক। আর তা হলো 'ইল্লাল্লাহ', এটি এ কথা সাব্যস্ত করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের হক্বদার এবং যোগ্য নয়। সাথে সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব করে। একাধিক আয়াতে এ দু'টি রোকনের সমর্থন এসেছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ٢٥٦﴾ [البَقَرَة : ٢٥٦]

অতএব যে কেউ তাগুত (তথা সকল গোমরাহকারী)-কে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয় সে এমন মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল যা ভেঙ্গে যাওয়ার নয়। [সূরা বাক্বারাহ, আয়াত ২৫৬]

আল্লাহর বাণীঃ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ (فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ) প্রথম রোকন তথা 'লা-ইলাহা'র অর্থ। আল্লাহর বাণীঃ (وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ) দ্বিতীয় রোকন তথা 'ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ। এমনিভাবে আল্লাহ্ ইবরাহীম (আঃ) এর উক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ "যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন।" [সূরা যুখরুফ, আয়াত: ২৬-২৭]

ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি "ইন্নানী বারাউন" প্রথম রোকন তথা নাফীর বা না বাচক লা-ইলাহার সারমর্ম। তাঁর উক্তি 'ইল্লাল্লাযি ফাতারানী' দ্বিতীয় রোকন তথা ইসবাত বা হ্যাঁ বাচকের সারমর্ম।

শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ এর রোকনসমূহ ঃ এর দু'টি রোকন রয়েছে। আর তা হলো শাহাদাতে আমাদের উক্তিঃ 'আব্দুহু ওয়া-রাসূলুহু'। অর্থাৎ মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতাকে প্রত্যাখ্যান করে। অতএব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। মর্যাদাবান এ দু'টি সিফাত বা গুণের মাধ্যমেই তিনি সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। এখানে 'আব্দ' শব্দের অর্থ হলোঃ আল্লাহর ইবাদতকারী ও তাঁর বান্দা। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন একজন মানুষ, মানুষ যে পদার্থ হতে সৃষ্টি তিনিও তা থেকেই সৃষ্ট। দুনিয়ার অন্য মানুষদের জীবনে যেমন ভাল-মন্দ ও বিপদাপদ আসে তিনিও তার আওতাভূক্ত। আল্লাহ্ রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "বলুনঃ আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ। [সূরা কাহ্ফ, আয়াত: ১১০] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিপূর্ণভাবে উবূদিয়্যাহ তথা দাসত্বের হক্ব আদায় করেছেন। মহান আল্লাহও এ বিষয়ে তাঁর প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ "আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?" [সূরা আয্ যুমার, আয়াত: ৩৬]

﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَٰبَ وَلَمۡ يَجۡعَل لَّهُۥ عِوَجَاۜ ١ ﴾ [الكهف : ١]

অর্থ ঃ সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি"। [সূরা কাহ্ফ, আয়াত-১]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ١ ﴾ [الإسراء : ١]

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, যিনি আপন বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত"। [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ০১]

রাসূলের অর্থ ঃ সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে বিশ্ব মানবতাকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার জন্য প্রেরিত ব্যক্তিত্ব।

এ দু'গুণের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তাঁর ক্ষেত্রে কোন বাড়াবাড়ি বা মর্যাদাহানী করা যাবে না। রাসূলের উম্মতের দাবীদার অনেক ব্যক্তিই তাঁর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করে। এমনকি তাঁকে দাসত্বের স্তর থেকে উপরে উঠিয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁরই ইবাদত শুরু করেছে!! ফলে অনেকেই তাঁর নিকটে ফরিয়াদ করে! তাঁর নিকটে এমন জিনিস প্রার্থনা করে যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ দিতে সক্ষম নয়!! যেমন- প্রয়োজন মিটানো এবং বিপদাপদ দূর করা ইত্যাদি। অপর দিকে আরেক দল আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাতকে অস্বীকার বা তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি ও শিথিলতা করেছে। সাথে তাঁল মতামত ও উক্তি বিরোধী বিষয়ের উপর নির্ভর করতঃ তাঁর হাদীসসমূহ ও বিধানাবলীর অপব্যাখ্যা করে বিপথগামী হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ শাহাদাতাইনের শর্তাবলী ঃ

ক- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলী ঃ 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষের মাঝে সাতটি শর্ত রয়েছে। এই সাতটি শর্ত এক সাথে পাওয়া না গেলে তা পাঠে কোন উপকার হবে না। সংক্ষিপ্তাকারে সেই সাতটি শর্ত হলোঃ

১- ইলম বা জ্ঞান যা অজ্ঞতা-মূর্খতার বিপরীত।

২- দৃঢ় বিশ্বাস যা সন্দেহের বিপরীত।

৩- গ্রহণ করা যা প্রত্যাখ্যানের বিপরীত।

৪- আনুগত্য করা যা ছেড়ে দেওয়ার বিপরীত।

৫- সত্যনিষ্ঠতা যা মিথ্যার বিপরীত।

৬- ইখলাস বা একনিষ্ঠতা যা শিরকের বিপরীত।

৭- ভালবাসা যা ক্রোধের বিপরীত।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলীর ব্যাখ্যা ঃ

প্রথম শর্তঃ ইলম বা জ্ঞানার্জন করা ঃ অর্থাৎ এ কালিমার উদ্দিষ্ট অর্থ, এর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক দিক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। যা এই কালিমা সম্পর্কে অজ্ঞতার বিপরীত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا يَمۡلِكُ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٨٦﴾ [الزُّخۡرُف : ٨٦]

"ওরা তাঁর পরিবর্তে যাদের ডাকে, তারা সুপারিশেরও ইখতিয়ার রাখে না। তবে (সুপারিশ করতে পারবে) শুধু তারা, যারা সত্যকে স্বীকার করেছে আর তারা জানত-বুঝত"। [সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৮৬]।

শাহিদা ঃ অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র** সাক্ষ্য দেয়, অহুম ই'য়ালামুন ঃ অর্থাৎ তাদের মুখে তারা যে সাক্ষ্য দিয়েছে তা তারা হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করে। যদি কেউ অর্থ না বুঝে বা না জেনে **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** পাঠ করে তবে সেটা তার উপকারে আসবে না। কারণ এই কালিমা যে সকল বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে তা সে আক্বীদাহ্ বা বিশ্বাস রাখে না।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ দৃঢ় বিশ্বাস ঃ এ কালিমার স্বীকৃতি এমন দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচল প্রত্যয় সহকারে দিতে হবে যাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকবে না। যদি এর সার্বিক বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে তবে এ কালিমা তার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ١٥﴾ [الحُجُرَات : ١٥]

"তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। তারপর সন্দেহে-সংশয়ে পড়েনি এবং আল্লাহর পথে জীবন ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করেছে। তারাই সত্যনিষ্ঠ" (সূরা হুজরাত, আয়াত: ১৫)

যদি কেউ এ কালিমার প্রতি সামান্য সন্দেহ পোষণ করে তবে সে মুনাফিক্ব বলে গণ্য হবে। হাদীসে নববীতে বর্ণিত হয়েছেঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুরাইরাহ্ (রা.) কে বলেনঃ "এই প্রাচীরের পিছনে- এমন যার সাথেই তোমাদের দেখা হবে যে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেয়, তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দাও"। (সহীহ্ মুসলিম ১/১৩৩) অতএব, যে ব্যক্তি এ কালিমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে না সে জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য নয়।

তৃতীয় শর্ত ঃ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছুর ইবাদত (উপাসনা) পরিত্যাগ করাসহ এ কালিমার যাবতীয় দাবী মেনে নেয়া। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি এ কালিমা মুখে উচ্চারণ করে কিন্তু বাস্তবে তা গ্রহণ করতঃ সে অনুযায়ী আমল না করে তবে সে ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ ٣٥ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٖ مَّجۡنُونٖ ٣٦﴾ [الصَّافَّات : ٣٥ - ٣٦]

"তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব।" [সূরা সফফাত, আয়াত ৩৫-৩৬]

কবর, মাজার, দরগাহ ইত্যাদিতে যারা শরয়ী নিয়মের বাইরে বানোয়াট আমল করে তাদেরও এর সাথে সাদৃশ্য তৈরী হয়। কারণ তারা 'লা-ইলাহা

ইল্লাল্লাহ’ বলা সত্ত্বেও শিরকযুক্ত আমল পরিত্যাগ করে না। তাই তারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থকে গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে না।

চতুর্থ শর্ত ঃ এ কালিমা যে সকল বিষয়ের প্রমাণ বহন করে তা মেনে চলা। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٢٢﴾ [لُقۡمَان : ٢٢]

যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে এবং সে হয় সৎকর্মপরায়ণ, নিশ্চয় সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরে। [সূরা লুক্বমান, আয়াত-২২]

আয়াতে বর্ণিত উরওয়াতুল উসকা হলঃ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। ইয়ূসলিম অজহাহুর অর্থ ঃ ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর আনুগত্য করে।

পঞ্চম শর্ত ঃ সত্যনিষ্ঠা ঃ হৃদয় বা অন্তরের সত্যতা সহকারে এ কালিমা পাঠ করতে হবে। যদি অন্তরে সত্যায়ন না করে শুধু মুখে এ কালিমা উচ্চারণ করে তবে সে ব্যক্তি মিথ্যুক ও মুনাফিক্ব বলে বিবেচিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ١٠﴾ [البَقَرَة : ٨ - ١٠]

“আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। বস্তুত তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না। কিন্তু তারা তা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি, আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি। কারণ, তারা মিথ্যাচার করত। [সূরা বাক্বারাহ, আয়াত ৮-১০]

ষষ্ঠ শর্ত ঃ ইখলাস ঃ তথা বান্দার সকল কর্মকে শিরকের যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করা। সুতরাং বান্দা এ কালিমা উচ্চারণের মাধ্যমে দুনিয়ার কোন লোভনীয় বস্তু, সুনাম ও সুখ্যাতির উদ্দেশ্য করবে না। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, “নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। (ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না।” (বুখারী ১৭/৮)

সপ্তম শর্ত ঃ এ কালিমা অনুযায়ী যারা আমল করেন তাদেরকে ভালবাসা ঃ আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ ١٦٥﴾ [البَقَرَة : ١٦٥]

মানুষের মধ্যে কতক এমন, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে (তাঁর) এমন সমকক্ষ সাব্যস্ত করে যে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদের ভালবাসে। আর যারা ইমানদার, তারা আল্লাহকে অনেক বেশী ভালবাসে। [সূরা বাকারাহ, আয়াত : ১৬৫)

শাহাদাতু ‘আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ’র শর্তাবলী নিম্নরূপঃ

১- স্বীকারোক্তিসহ মুখে ও অন্তরে রাসূলের রিসালাতকে বিশ্বাস করা। ২- প্রকাশ্যে এ কালিমা মুখে উচ্চারণ করা। ৩- রাসূলের আনুগত্য করা। তিনি যে সত্য নিয়ে এসেছেন সে অনুযায়ী আমল করা। যে সকল বাতিল থেকে নিষেধ করেছেন তা হতে দূরে থাকা। ৪- তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের যে সকল অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা। ৫- নিজের জীবন, ধন-সম্পদ, সন্তানাদি, পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ থেকেও তাঁকে বেশী ভালবাসা। ৬- রাসূল এর কথাকে সকলের কথার উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং তার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করা।

চতুর্থ ঃ শাহাদাতাইনের দাবী ঃ

ক- শাহাদাতু আল্লা-ইলাহার দাবী ঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যত বাতিল মাবূদ আছে তাদের ইবাদত ত্যাগ করা। কালিমায়ে তাওহীদে আমাদের না বোধক বাণী "লা-ইলাহা" এর উপর প্রমাণ বহন করে। এবং শরীকহীন এক আল্লাহর ইবাদত করা। কালিমায়ে তাওহীদে আমাদের হ্যাঁ বোধক বাণী "ইল্লাল্লাহ" এর উপর প্রমাণ বহন করে। অনেক লোক এ কালিমা উচ্চারণ করে ঠিক কিন্তু বাস্তবে তার দাবীর বিপরীত কাজ করে। ফলে মুখে সে আল্লাহ ছাড়া অন্যের মাবূদ হওয়া অস্বীকার করলেও বাস্তবে তা অনেক সৃষ্টিজীব, কবর, মাযার, তাগুত, গাছ-পালা এবং পাথরের জন্য স্বীকার করে। এ সমস্ত লোকেরাই বিশ্বাস করে যে, তাওহীদ হলো নব আবিষ্কৃত বিষয় (বিদআত)। যারা তাদেরকে এ পথে আহ্বান করে তাদেরকে তারা অস্বীকার করতঃ তাদের প্রতিবাদ করে। যারা এক আল্লাহর জন্য যাবতীয় ইবাদতকে নিষ্ঠার সাথে পালন করে তাদেরকে তারা দোষারোপ ও ঘৃণা করে।

খ- শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' এর দাবী ঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা, তাঁকে সত্যায়ন করা, তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকা, নব আবিষ্কৃত মনগড়া তরীকা বাদ দিয়ে কেবল মাত্র তাঁর সুন্নাত মোতাবেক আমল করা এবং তাঁর কথাকে সকল মানুষের কথার উপর প্রাধাান্য দেয়া।

পঞ্চম ঃ কালিমায়ে শাহাদাত বা শাহাদাতাইন ভঙ্গকারী বিষয়সমূহঃ

এগুলো হল ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ। কারণ, শাহাদাতাইনের উচ্চারণের মাধ্যমেই কোন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করে। এ কালিমা উচ্চারণ করার অর্থ হল এর নির্দেশিত পথকে স্বীকার করা এবং এ কালিমার দাবী অনুযায়ী বিভিন্ন ইসলামী নিয়ম কানুন মেনে চলা। যদি কেউ এ সকল নিয়ম কানুন মেনে না চলে তবে শাহাদাতাইন উচ্চারণের সময় সে যে অঙ্গীকার ছিল তা ভঙ্গ করল। ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ অনেক। ফিক্বাহবিদগণ ফিক্বাহ শাস্ত্রে 'বাবুর রিদ্দাহ' নামে পৃথক একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। ইসলাম বিনষ্টকারী দশটি বিষয় নিম্নে পেশ করা হলঃ

১। আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শিরক (শরীক) করা ঃ

আল্লাহ বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর তাকে ক্ষমা করেন না যে লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। [সূরা আন্ নিসা, আয়াত ৪৮, ১১৬]

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই"। [সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত ৭২]

২। আল্লাহ্ এবং বান্দার মাঝে মাধ্যম তৈরী করে তাদেরকে ডাকা, তাদের নিকটে সুপারিশ তলব করা এবং তাদের উপর ভরসা করা। যারা এরূপ করবে তারা উলামাগণের সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যাবে।

৩। যারা মুশরিকদেরকে কাফির মনে করে না এবং তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের পথকেও সঠিক মনে করে। এরূপ আক্বীদাহ্ পোষণকারী ব্যক্তি।

৪। যারা বিশ্বাস করে যে, অন্যের হিদায়াত বা বিচার ফয়সালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিদায়াত ও বিচার ফয়সালা অপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণ ও উত্তম। যেমন, ঐ সমস্ত লোক যারা তাগুতের (আল্লাহদ্রোহী শক্তির) বিধানকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানের উপর প্রাধান্য দেয়। ঐ সমস্ত লোকেরাও এর আওতায় পড়বে যারা মানব রচিত মতবাদকে ইসলামী বিধানের উপর প্রাধান্য দেয়।

৫। যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সে অনুযায়ী আমল করা সত্ত্বেও এর কোন বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

৬। যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনের কোন অংশ, নেকী অথবা শাস্তি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে, সেও কাফির হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে মহান রব্বুল আলামীনের বাণী ঃ

"আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহ্কামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিলে? ছলনা করনা, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর।" [সূরা আত্ তাওবাহ, আয়াত ৬৫-৬৬)

৭। যাদু করা ঃ এর অন্তর্ভুক্ত, অন্যায়ভাবে বা নাজায়েয উপায়ে দু' ব্যক্তির মাঝে বিচ্ছেদ অথবা ভালবাসা সৃষ্টি করা। বিশেষতঃ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। যে এরূপ করবে অথবা এতে সন্তুষ্ট থাকবে সে কাফির। এর দলীল হলো আল্লাহর বাণী ঃ "তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যা দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে"। [সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত ১০২]

৮। মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করা। এ ব্যক্তি কাফির হওয়ার দলীল আল্লাহর বাণী ঃ

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্ট্রানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা মায়িদাহ, আয়াত-৫১]

৯। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, এমনও কিছু লোক রয়েছেন যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীয়ত মানতে বাধ্য নয়। যেমন, খিজির মূসা (আ.) এর শরীয়তের আওতাভূক্ত ছিলেন না। এরূপ আক্বীদাহ্ (বিশ্বাস) পোষণকারী ব্যক্তি কাফির। শাইখ সালিহ ফাওযান বলেন, এর আওতাভূক্ত হবে অতিরঞ্জনকারী সূফীদের আক্বীদাহ্ বা বিশ্বাসঃ তারা এমন এক স্তরে গিয়ে পৌছে যে, ঐ স্তরে তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না!! এমন আক্বীদাহ্ পোষণকারী সূফীরাও কাফির।

১০। আল্লাহর দ্বীন ইসলাম হতে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকা। ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা এবং সে অনুযায়ী আমল না করা। মহান আল্লাহ বলেনঃ " আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়"। [সূরা আল আহকাফ]

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ "যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে জালিম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিব।" [সূরা আস্ সাজদাহ, আয়াত : ২২]

শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহ.) বলেন,

উল্লেখিত ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়াবলীতে হাসি ঠাট্টার ছলে, স্বেচ্ছায় কিংবা ভীত-শঙ্কিত হয়ে করার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে যাকে এসকল বিষয় করতে বাধ্য করা হয় তার বিষয়টি ভিন্ন। ইসলাম বিনষ্টকারী প্রতিটি বিষয়ই কঠিন ও মারাত্মক। এ সকল বিষয় বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে সংঘটিত হচ্ছে। অতএব মুসলিম ব্যক্তির উচিত এগুলো থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যদের সতর্ক করা। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর ক্রোধ ও কঠিন শাস্তি আবশ্যককারী বিষয়াবলী হতে আশ্রয় চাচ্ছি। (মাজমুআতুত্তাওহীদ আন-নাজদিয়্যাহ্, পৃ. ৩৭-৩৯)



কবীরা গুনাহ

পৃথিবীতে যত পাপ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর পাপ হলো আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা। পৃথিবীতে শিরকের চেয়ে জঘণ্য আর পাপ নেই। যে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের একটি মুহূর্তও কাটে না, কাউকে তাঁর সমকক্ষ, সমতুল্য বা সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার চেয়ে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে? তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ٤٨﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য (পাপ) যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যে কেউ আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করল, সে মারাত্মক গোনাহে লিপ্ত হল। [সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৪৮]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, 'তুমি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করা; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' (বুখারী: ৬০০১, মুসলিম:৮৬)

আল্লাহর সাথে শিরক করার অর্থ আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি অন্য কারও ইবাদত করা। তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতির পাশাপাশি অন্য কারও দাসত্বও মেনে নেওয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗا ٣٦﴾ [النِّسَاء : ٣٦]

'তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না'। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشۡرِكَ بِهِۦٓۚ ٣٦﴾

[الرَّعۡد : ٣٦]

'বল, আমাকে কেবল আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি আল্লাহর ইবাদাত করি এবং তার সাথে শরীক না করি'। [সূরা আর- রা'দ, আয়াত: ৩৬]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন,

﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠﴾ [الكَهۡف : ١١٠]

'সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। [সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ১১০]

শিরক যে সবচেয়ে বড় জুলুম ও নিকৃষ্টতম পাপ

তা কতভাবেই না আল্লাহ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ ﴾ [لُقْمَان : ١٣]

'আর স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, 'প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয় শিরক হল বড় জুলুম'। [সূরা লুকমান, আয়াত: ১৩]

যে শিরক করে সে যালিম। কারণ আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন আর সে ইবাদত করছে অন্য কারও। সে তো নিমকহারাম; অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ ﴾ [الأَعْرَاف : ١٩١ - ١٩٢]

'তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে, যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়? আর তারা তাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজদেরকেও সাহায্য করতে পারে না'। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৯১-১৯২]

তিনি তাকে রিযিক দেন আর সে অন্য কারও শুকরিয়া আদায় করে। সে নুন খায় একজনের আর গুণ গায় আরেকজনের। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ ﴾ [النَّحل : ٧٣]

'আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপসনা করে, যারা আসমানসমূহ ও যমীনে তাদের কোন রিযকের মালিক নয় এবং হতেও পারবে না'। [সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৭৩]

মুশরিকের শাস্তি:

শিরক যেহেতু বড় গুনাহ, তাই আল্লাহ শিরককারী তথা মুশরিককে শাস্তিও দেবেন বড় মর্মন্তুদ।

প্রথম শাস্তি:

আল্লাহ মুশরিকের সালাত, যাকাত, সিয়াম বা হজ কোন কিছুই কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে তাওবা করে ফিরে আসে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ ﴾ [الأَنْعَام : ٨٨]

'আর যদি তারা শিরক করত, তারা যা আমল করেছিল তা অবশ্যই বরবাদ হয়ে যেত'। [সূরা আল- আন'আম, আয়াত: ৮৮]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾ ﴾ [الزُّمَر : ٦٥]

'আর অবশ্যই তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি শিরক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই। আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৫]

দ্বিতীয় শাস্তি:

তাওবা না করে মারা গেলে আল্লাহ কোনো শিরককারীকে ক্ষমা করবেন না। যদিও সে সালাত, যাকাত, সিয়াম বা হজ আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ ﴾ [النِّسَاء : ٤٨]

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য (পাপ)- যার জন্য ইচ্ছা- ক্ষমা করবেন। আর যে কেউ আল্লাহর শরীক

সাব্যস্ত করল, সে মারাত্মক গোনাহে লিপ্ত হল’। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮]

অতএব সব গুনাহই আল্লাহ মাফ করতে পারেন যা পরিত্যাগ না করেই সে মৃত্যুবরণ করেছে, কেবল শিরক ছাড়া। শিরক থেকে তাওবা না করে মারা গেলে তার নিস্তার নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

﴿وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ ٤٨﴾ [النِّسَاء : ٤٨]

‘এ ছাড়া অন্যান্য (পাপ)- যার জন্য ইচ্ছা- ক্ষমা করবেন’। [সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৪৮]

হাদীসেও দেখুন সেই একই কথার পুনর্ধ্বনি। শিরক না করে শত পাপ করেও নাজাতের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শিরকের ক্ষমা নেই। সাহাবী আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

‘আমার সামনে জিবরীল আবির্ভূত হলেন। তিনি বললেন, আপনি আপনার উম্মতকে সুসংবাদ দিন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে থাকে? তিনি বললেন, যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে থাকে। আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে থাকে? তিনি বললেন, যদিও সে মদ পান করে’। (বুখারী : ৬৪৪৩; মুসলিম : ৯৪)

তৃতীয় শাস্তি :

আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তার সঙ্গে কাফেরের অনুরূপ আচরণ করবেন। যদিও সে সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে, সিয়াম পালন করে এবং হজ সম্পাদন করে, আর নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে। আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢﴾

[المَائِدَة : ٧٢]

যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করবে, নিশ্চয় আল্লাহ ওর জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং ওর বাসস্থান জাহান্নাম। আর অপরাধীদের কোন সাহায্যকারী নেই। [সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৭২]

পক্ষান্তরে অন্তত শিরক না করে কেউ যদি মারা যায় তাহলে তার জন্য পরিত্রাণের বার্তা রয়েছে। জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার না করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে কোনো অংশীদার সাব্যস্ত করে সাক্ষাৎ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে’। (মুসলিম : ৯৩)

চতুর্থ শাস্তি:

মুশরিকের ক্ষেত্রে ফেরেশতা, নবী বা মুমিন তথা কোনো সুপারিশকারীই কাজে আসবে না। পীরের কথা তো বলাই বাহুল্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ٤٨﴾ [المُدَّثِّر : ٤٨]

‘অতএব, সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকার করবে না’। [সূরা আল মুদ্দাসসির, আয়াত : ৪৮]

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

‘যখন আল্লাহ বান্দাদের বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন এব জাহান্নামীদের থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ রহমত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দেবেন যে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করেনি, তাদের যেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়। যাদের প্রতি আল্লাহ

দয়া করবেন, যারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। জাহান্নামে ফেরেশতারা সিজদার চিহ্ন দেখে তাদের চিনতে পারবেন। আগুন বনী আদমের সবই ভস্ম করতে পারবে কিন্তু সিজদার চিহ্ন ভস্ম করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ জাহান্নামের জন্য সিজদার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেওয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে'। [বুখারী : ৭৪৩৭]

পঞ্চম শাস্তি :

শিরককারীদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুপারিশ করবেন না। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

'প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে কবুল দো'আ রয়েছে। প্রত্যেক নবীই আগেভাগে দো'আ করে ফেলেছেন। আর আমি আমার দো'আকে গোপন রেখেছি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য। অতএব সেটি আমার প্রত্যেক উম্মতই ইনশাআল্লাহ পাবে যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক না করে মারা যাবে'। [মুসলিম]

কখনো মুশরিকদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কোনো কোনো মুসলিম শিরকে লিপ্ত হন। যেমন মূসা (আ.) এর সগোত্রীয় লোকেরা সমুদ্রডুবি ও ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শিরকে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘটনা তুলে ধরে বলেন,

﴿ وَجَٰوَزۡنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فَأَتَوۡاْ عَلَىٰ قَوۡمٖ يَعۡكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصۡنَامٖ لَّهُمۡۚ قَالُواْ يَٰمُوسَى ٱجۡعَل لَّنَآ إِلَٰهٗا كَمَا لَهُمۡ ءَالِهَةٞۚ قَالَ إِنَّكُمۡ قَوۡمٞ تَجۡهَلُونَ ١٣٨ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٞ مَّا هُمۡ فِيهِ وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٣٩ قَالَ أَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡغِيكُمۡ إِلَٰهٗا وَهُوَ فَضَّلَكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٤٠ ﴾ [الأعراف : ١٣٨ - ١٤٠]

'আর বনী ইসরাঈলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। অতঃপর তারা আসল এমন এক কওমের কাছে যারা নিজেদের মূর্তিগুলোর পূজায় রত ছিল। তারা বলল, 'হে মূসা, তাদের যেমন উপাস্য আছে আমাদের জন্য তেমনি উপাস্য নির্ধারণ করে দাও। সে বলল, 'নিশ্চয় তোমরা এমন এক কওম যারা মূর্খ। নিশ্চয় এরা যাতে আছে, তা ধ্বংসশীল এবং তারা যা করত তা বাতিল। সে বলল, 'আল্লাহ ছাড়া আমি কি তোমাদের জন্য অন্য ইলাহ সন্ধান করব, অথচ তিনি তোমাদেরকে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন?' [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৩৮-১৪০]

একইভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় দেখা যায়, মুসলিমরা হুনায়নের যুদ্ধে বের হলে অজ্ঞতাবশত তারাও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একই ধরনের আবেদন করে বসেন। যেমন সাহাবী আবূ ওয়াকেদ লাইছী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

'আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হুনায়নের (যুদ্ধের) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি (নওমুসলিম)। একস্থানে পৌত্তলিকদের একটি কুলগাছ ছিল যার চার পাশে তারা একান্তভাবে বসত এবং তাদের সমরাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। গাছটিকে তারা 'যাতু আনওয়াত' বলত। আমরা একদিন একটি কুলগাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, মুশরিকদের যেমন 'যাতু আনওয়াত' আছে আমাদের জন্যও অনুরূপ 'যাতু আনওয়াত' (একটি গাছ) নির্ধারণ করে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহু আকবার', তোমাদের এ দাবিটি পূর্ববর্তী লোকদের রীতিনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা এমন কথাই বলেছ যা বনী ইসরাঈল মূসা (আ.)কে বলেছিল। তারা বলেছিল,

‘হে মূসা, মুশরিকদের যেমন মা‘বুদ আছে আমাদের জন্যও তেমন মা‘বুদ বানিয়ে দাও। মূসা (আ.) বললেন, তোমরা মূর্খের মতো কথাবার্তা বলছ’ [সূরা আল-আরাফ : ১৩৮] তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতিনীতিই অবলম্বন করছ। (তিরমিযী: ২১৮; তাবরানী: ৩২৯১; আহমাদ: ২১৯০০; তিরমিযী এ হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।)

শিরকের রয়েছে নানা ধরণ ও প্রকার। আল্লাহ তা‘আলা সবগুলোই স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ ١١٩﴾ [الأَنۡعَام : ١١٩]

অথচ তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, যা তোমাদের উপর হারাম করেছেন’। [সূরা আন-আন‘আম, আয়াত: ১১৯]

আল্লাহ যা দ্ব্যর্থহীনভাবে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন, শিরক করা তার অন্যতম। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ١٥١﴾ [الأَنۡعَام : ١٥١]

‘বল, ‘এসো, তোমাদের উপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তেলাওয়াত করি যে, তোমরা তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে রিযক দেই এবং তাদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না- তা থেকে যা প্রকশ পায় এবং যা গোপন থাকে। আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। এগুলো আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার’। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫১]

শিরকের প্রথম প্রকার ঃ

আল্লাহর সঙ্গে বা তাঁকে ছাড়াই ফেরেশতা বা নবীদের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। যে তাদের ইবাদত করবে সে আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী করবে এবং নিজ মুনিবের সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্তকারী হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا يَأۡمُرَكُمۡ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرۡبَابًاۚ أَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡكُفۡرِ بَعۡدَ إِذۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ ٨٠﴾

[آل عِمۡرَان : ٨٠]

‘আর তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীদেরকে রব রূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন’? [সূরা আল ইমরান, আয়াত: ৮০]

দ্বিতীয় প্রকার ঃ

আল্লাহর সঙ্গে বা তাঁকে ছাড়াই ওলী-বুযুর্গানের উদ্দেশে ইবাদত করা। যে তাদের ইবাদত করবে সে নিজ মুনিবের সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١﴾ [التَّوۡبَة : ٣١]

তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগী বুযুর্গদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারয়াম পুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে। তিনি ছাড়া

কোনো (হক) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র। [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৩১]

﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ٢٣﴾ [نُوح : ٢٣]

'আর তারা বলে, 'তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাসরকে'। [সূরা নূহ, আয়াত : ২৩]

ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাসর এদের প্রত্যেকেই ছিলেন সৎপরায়ন ব্যক্তিত্ব। আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে তারা এসব ব্যক্তির সন্তুষ্টিও খুঁজত ইবাদতে। তাই বুযুর্গকে খুশী করতে কোন ইবাদতের অবকাশ নেই।

তৃতীয় প্রকার ঃ

আল্লাহর সঙ্গে বা তাঁকে ছাড়াই বৃক্ষরাজি বা ইট-পাথরের উদ্দেশে ইবাদত তথা ভক্তি নিবেদন করা। যে এসবের উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করবে সে নিজ মুনিবের সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ ١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ ٢٠﴾ [النَّجم : ١٩ - ٢٠]

'তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও 'উয্যা সম্পর্কে? এবং মানাত সম্পর্কে, যা তৃতীয় আরেকটি?' [সূরা আন-নাজম, আয়াত : ১৯-২০]

চতুর্থ প্রকার ঃ

শয়তানের উদ্দেশে ইবাদত তথা ভক্তি নিবেদন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٦٠ وَأَنِ ٱعۡبُدُونِي هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ ٦١﴾ [يس : ٦٠ - ٦١]

'হে বনী আদম, আমি কি তোমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমারই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ'। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৬০-৬১]

এক কথায় রহমান আল্লাহ ছাড়া যার উদ্দেশেই ভক্তি-ইবাদত নিবেদন করা হবে তা শয়তানের জন্য বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿إِن يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثٗا وَإِن يَدۡعُونَ إِلَّا شَيۡطَٰنٗا مَّرِيدٗا ١١٧ لَّعَنَهُ ٱللَّهُۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنۡ عِبَادِكَ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ١١٨﴾ [النِّسَاء : ١١٧ - ١١٨]

'আল্লাহ ছাড়া তারা শুধু নারীমূর্তিকে ডাকে এবং কেবল অবাধ্য শয়তানকে ডাকে। আল্লাহ তাকে লা'নত করেছেন এবং সে বলেছে, 'অবশ্যই আমি তোমাদের বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করব'।[সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১১৭-১১৮]

আবূ তোফায়েল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা.)কে নাখলাহ নামক স্থানে পাঠালেন। সেখানে উজ্জা নামের মূর্তি ছিল, খালেদ (রা.) সেখানে গেলেন। সেটি ছিল তিনটি গাছের উপর স্থাপিত। তিনি গাছগুলো কেটে ফেললেন এবং তার ওপরের ঘর ভেঙ্গে দিলেন। পরবর্তীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং এ ব্যাপারটি অবহিত করলেন। তিনি বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে দেখ, কোন কাজই হয়নি। তখন খালেদ (রা.) সেখানে আবার ফিরে গেলেন। তাকে দেখে (ঐ আশ্রমের) প্রহরীরা 'হে উজ্জা হে উজ্জা' বলে পাহাড়ের আড়ালে পলায়ন করল। খালেদ তার সামনে পৌঁছামাত্র এক চুল খোলা উলঙ্গ নারীকে দেখলেন সে নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করছে।

তিনি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে এসে বৃত্তান্ত তুলে ধরলেন। শুনে তিনি বললেন, সে ছিল উজ্জা। [নাসায়ী, সুনান আল কুবরা : ১১৪৮৩]

আর যে শয়তানের অনুসরণ-ইবাদত করে, শয়তান তাকে আল্লাহর সঙ্গে শিরক, কুফর ও বিদআত শেখায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ ١٢١ ﴾ [الأنعام : ١٢١]

'আর তোমরা তা থেকে আহার করো না, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি এবং নিশ্চয় তা সীমালঙ্ঘন এবং শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক'। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ১২১]

শয়তান মানুষের সঙ্গে কথা বলে বৈচিত্রময় ভঙ্গিতে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُم بِصَوۡتِكَ وَأَجۡلِبۡ عَلَيۡهِم بِخَيۡلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ وَعِدۡهُمۡۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ٦٤ ﴾ [الإسراء : ٦٤]

'তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত কর, তাদের উপর ঝাপিয়ে পড় তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হও এবং তাদেরকে ওয়াদা দাও'। আর শয়তান প্রতারণা ছাড়া তাদেরকে কোনো ওয়াদাই দেয় না'। [সূরা ইসরা, আয়াত : ৬৪]

আবু তোফায়ল থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলী যুগের দেবী উজ্জার সম্মুখে শয়তান আত্মপ্রকাশ করেছিল। তখন খালেদ ইবন ওলীদ (রা.) তাকে হত্যা করে ফেলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে এসে বৃত্তান্ত তুলে ধরলে তিনি বললেন, সে ছিল উজ্জ। [নাসায়ী : প্রাগুক্ত]

ইমাম বুখারী দীর্ঘ এক হাদীসে অনুরূপ ঘটনা তুলে ধরেন। আবু হুরায়রা (রা.) এর কাছে শয়তান এসেছিল এবং তিন রাত অবস্থান করেছিল। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি কি জানো তিন রাত তুমি কার সঙ্গে কথা বলেছ হে আবূ হুরায়রা? তিনি বললেন, জী না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে ছিল শয়তান'। [বুখারী : ২৩১১]

মোটকথা, শয়তান তার কণ্ঠ ও কর্ম দিয়ে মুশরিকদের বিভ্রান্ত করেছে। অথচ তারা ভেবেছে এ বুঝি কেবল একটি চিত্র বা কবরস্থ কেউ। কিয়ামত পর্যন্তই সে এভাবে ছলে-বলে-কৌশলে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে যাবে। আমাদের কর্তব্য হবে, সর্বদা শয়তানের চক্রান্ত ও প্ররোচনা সম্পর্কে সতর্ক থাকা। আল্লাহর কাছে দিবারাত্র শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কূটচাল থেকে বাঁচার জন্য দোআ করা। আল্লাহ আমাদেরকে সব ধরণের শিরক থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে শিরকমুক্ত ঈমান নিয়ে কবরের যাত্রী বানান। আমীন!



যাদু ও ভাগ্য গণনা

যাদু, রাশিচক্র, ভবিষ্যৎ গণনা ইত্যাদি শয়তানী কাজ-কর্ম এবং হারাম, যা আকীদায় ত্রুটি সৃষ্টি করে কিংবা আকীদা নষ্ট করে দেয়। কেননা শিরকী কাজ-কর্ম ছাড়া এগুলো অর্জন করা যায় না।

১. যাদুঃ

যাদু এমন এক বস্তুকে বলা হয় যার উপকরণ অত্যন্ত গোপন ও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। আর যাদুকে যাদু নামে এজন্য অভিহিত করা হয় যে, এটা এমন সব গোপনীয় কাজের মাধ্যমে অর্জিত হয় যা দৃষ্টির অগোচরে থাকে। যাদুর মধ্যে মন্ত্র পাঠ, ঝাড়ফুঁক, বাণী উচ্চারণ, ঔষধপত্র ও ধূম্রজাল- এসব কিছুর সমাহার থাকে। যাদুর প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে। কোনো যাদু মনের ওপর আছর করে এবং কোনোটা দেহের ওপর। ফলে মানুষ কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ে, কখনো নিহতও হয়। এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা যায়। যাদুর এ আছর ও প্রতিক্রিয়া আল্লাহ তা'আলার পার্থিব ও তাক্বদীরে নির্ধারিত হুকুম ও অনুমতি ক্রমেই হয়ে থাকে। আর এটা পুরোপুরি শয়তানী কাজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাদু-বিদ্যা আয়ত্ব করতে হলে শিরকের মাধ্যমে এবং অপবিত্র ও দুরাত্মাদের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে তাদের নৈকট্য লাভের আশ্রয় নিতে হয়। এজন্যই শরী'আতে শিরকের সাথে যাদুর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে বেঁচে থাক, সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন সেগুলো কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং যাদু করা..... " [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৬৬]

যাদু দু'ভাগে শিরকের অন্তর্ভুক্ত :

এক. এতে শয়তানদেরকে ব্যবহার করা হয়, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা হয় এবং তাদের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে তাদের নৈকট্য অর্জন করা হয়, যাতে তারা যাদুকরের কাজ আঞ্জাম দেয়। সুতরাং যাদু শয়তানদের শিখানো বস্তু। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ﴾ [البَقَرَة : ١٠٢]

“বরং শয়তানরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিত।” [সূরা বাক্বারাহ, আয়াত-১০২]

দুই : এতে গায়েবী এলেম ও তাতে আল্লাহর সাথে শরীক হবার দাবী করা হয়, যা মূলত: কুফুরী ও ভ্রষ্টতা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖۚ﴾ [البَقَرَة : ١٠٢]

“এবং তারা অবশ্যই জানে যে, যে কেউ তা খরিদ করে (অর্থাৎ যাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই”[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ১০২]

আর পুরো ব্যাপারটি যেহেতু এমন, সুতরাং নিঃসন্দেহে যাদু চর্চা কুফুরী ও শিরক, যা ইসলামী আক্বীদার পরিপন্থী এবং এর চর্চাকারীদের হত্যা করা ওয়াজিব। যেমন, একদল বড় বড় সাহাবী যাদুকরদের হত্যা করেছিলেন।

আজকাল মানুষ যাদু ও যাদুকরদের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করছে; বরং হয়তো অনেকেই একে এমন এক শিল্প হিসাবে গণ্য করছে যা তাদের গর্বের বিষয় এবং এর চর্চাকারীদের উৎসাহিত করার জন্য তারা বহু পুরস্কার প্রদান করছে। যাদুকরদের সম্মানে তারা বিভিন্ন উৎসব ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করছে, যাতে হাজার হাজার দর্শক চিত্ত-বিনোদন ও উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়ে থাকে। এসব কিছুই মূলতঃ দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা, আকীদার ব্যাপারে গাফিলতি ও শৈথিল্য প্রদর্শন এবং দীন ও আকীদা নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ারই নামান্তর।

২. ভাগ্য গণনা ও দৈব কর্ম :

এ উভয় ক্ষেত্রে গায়েবী এলেম ও অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানার দাবী করা হয়। যেমন, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কী হবে এবং কী ফলাফল অর্জিত হবে, হারানো বস্তুর প্রাপ্তিস্থান কোথায় প্রভৃতি সম্পর্কে খবর দেয়া, যা তারা শয়তানদের মাধ্যমে জেনে থাকে। আর শয়তানরা চুরি করে কান পেতে আসমান থেকে এসব সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿هَلۡ أُنَبِّئُكُمۡ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ٢٢١ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٖ ٢٢٢ يُلۡقُونَ ٱلسَّمۡعَ وَأَكۡثَرُهُمۡ كَٰذِبُونَ ٢٢٣﴾ [الشُّعَرَاء : ٢٢١ - ٢٢٣]

“আমি আপনাকে বলব কি, কার নিকট শয়তানরা অবতরণ করে? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গুনাহগারের ওপর। তারা দ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত : ২২১-২২৩]

এটা এভাবে হয় যে, শয়তান ফিরিশতাদের কিছু কথা চুরি করে শোনে এবং জ্যোতিষীর কানে তা ঢেলে দেয়। অতঃপর জ্যোতিষী এ কথার সাথে নিজের পক্ষ থেকে আরো শত মিথ্যা বানিয়ে তা পেশ করে। আর মানুষ আসমান থেকে শোনা সত্য কথাটির কারণে তার সকল মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নেয়। অথচ শুধু আল্লাহ তা‘আলাই গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। অতএব, যদি কেউ দাবী করে যে, সে ভাগ্য গণনা ও রাশি চক্র বা অন্য কোনো মাধ্যমে এই জ্ঞানে আল্লাহর সাথে শরীক অথবা কেউ এরকম দাবীদারকে সত্যবাদী মনে করে, তাহলে সে আল্লাহর জন্য যা খাস তাতে তাঁর শরীক স্থির করলো।

দৈব কর্মও শিরক থেকে মুক্ত নয়। কেননা, এতে শয়তানদের উদ্দেশ্যে তাদের প্রিয় জিনিস পেশ

করে তাদের নৈকট্য অর্জন করা হয়। ফলে এতে আল্লাহর এলেমে তার শরীক হবার দাবী করার মাধ্যমে একদিকে যেমন রুবুবিয়াতে শিরক করা হচ্ছে, তেমনি অন্য দিকে কিছু ইবাদতের মাধ্যমে গায়রুল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কারণে উলুহিয়াতেও শিরক করা হচ্ছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষী ও ভাগ্য গণনাকারীর কাছে আসে এবং সে যা বলে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ সত্যের প্রতি কুফুরী করল"। (মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ৯৫৩৬)

বর্তমানে এ ব্যাপারে নিজে সাবধান হওয়া ও লোকজনকে সাবধান করা জরুরি যে, যাদুকর, ভাগ্য গণনাকারী, জ্যোতিষী সকলেই মানুষের আকীদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তারা নিজেদেরকে চিকিৎসকরূপে পেশ করছে। আর রোগ-ব্যাধিগ্রস্ত লোকদেরকে গায়রুল্লার উদ্দেশ্যে যবেহ ও কুরবানী করার নির্দেশ প্রদান করছে। যেমন, অমুক অমুক ধরণের বকরী বা মুরগী যেন তারা যবেহ করে।

অথবা তারা রোগীদেরকে শিরকী কবচ ও শয়তানী তাবীয লিখে দেয়। অতঃপর তা কৌটায় পুরে রোগীদের গলায় ঝুলিয়ে দেয় কিংবা তাদের সিন্দুকে বা ঘরে রেখে দেয়। কেউ কেউ আবার নিজেকে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদদাতা ও হারানো বস্তুর প্রাপ্তিস্থান অবহিতকারী হিসাবে প্রকাশ করে। ফলে তার কাছে অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা এসে হারিয়ে যাওয়া বস্তুসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। অতঃপর সে তাদেরকে এ বস্তুর খবর দেয় কিংবা নিজেই তা শয়তান সহচরদের মাধ্যমে তাদের জন্য হাযির করে।

কেউ কেউ আবার নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতা ও কারামাতের অধিকারী অলী হিসেবে প্রকাশ করে। যেমন, সে আগুনে প্রবেশ করে, অথচ আগুন তার ওপর কোনো আছর করে না। সে নিজেকে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে কিংবা গাড়ীর চাকার নিচে নিজেকে পিষ্ট করে, অথচ তার গায়ে আঘাত ও পিষ্ট হওয়ার কোন চিহ্নই থাকে না। এছাড়া সে আরো নানা ধরনের ভেলকি দেখিয়ে থাকে, যা প্রকৃত পক্ষে যাদু ও শয়তানী কাজেরই শামিল, যাতে কোনো বাস্তবতাই নেই; বরং এগুলো সূক্ষ্ম কৌশল ও ছলনা যা তারা মানুষের সামনে নিপুণভাবে উপস্থাপন করে। যেমন, ফিরাআউনের যাদুকররা লাঠি ও রশি দিয়ে যাদু দেখিয়েছিল।

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.) কিছু সংখ্যক বাতায়েহী আহমাদী (রিফায়ী) নামধারী যাদুকরদের সাথে তার বিতর্ক প্রসঙ্গে বলেন, বাতায়েহীদের নেতা উচ্চস্বরে বলল: আমাদের এমন এমন অবস্থা ও বিষয়-আশয় রয়েছে। এরপর সে অগ্নি ইত্যাদির আছর দূর করার মতো তাদের অলৌকিক শক্তির দাবী করে বসল এবং বলল যে, সে কারণে তাদের এই অবস্থানগুলো মেনে নেওয়া উচিত। শাইখুল ইসলাম বলেন, আমিও তখন উত্তেজিত স্বরে বললাম যে, আমি দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমের সকল আহমদীকে বলতে চাই তারা আগুনে প্রবেশ করে যা করবে, আমিও হুবহু তাই করতে পারব। এতে যে পুড়ে যাবে সে পরাজিত হবে। বোধ হয় এও বলেছি যে, তার ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে। তবে এ কাজ করতে হবে আমাদের দেহ সিরকা ও গরম পানি দিয়ে ধৌত করার পর।

এ কথা শুনে আমির উমারা ও সাধারণ লোকজন এর কারণ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম, আগুন নিয়ে এসব করার মধ্যে তাদের কিছু ছল-চাতুরি রয়েছে। তারা ব্যাঙের তেল, নারকেলের খোসা ও তালক নামক এক প্রকার পাথর দ্বারা কিছু জিনিস তৈরি করে শরীরে মাখে।

এতে লোকজন হৈ-চৈ শুরু করে দিল। তা দেখে সে লোকটি জাহির করতে লাগলো যে, সে এমতাবস্থায়ও আগুনে প্রবেশ করতে সক্ষম এবং বলল, আমাদের শরীর বারুদ দিয়ে মেখে আমাকে ও আপনাকে একটি কুঠুরিতে লেপ্টে রাখা হোক। আমি বললাম, চলুন ঠিক আছে। এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমি বারবার তাকে তাগাদা দিতে লাগলাম। এতে সে হাত বাড়িয়ে জামা খোলার ভাব দেখাল। আমি বললাম, গরম পানি ও সিরকা দিয়ে গোসলের আগে নয়। এর পর অভ্যাসানুযায়ী সে নিজ ধারণা ব্যক্ত করে বলল, যে আমীরকে ভালোবাসে সে যেন কাঠ নিয়ে আসে অথবা বলল, সে যেন এক বোঝা লাকড়ি নিয়ে আসে। আমি বললাম, লাকড়ি আনতে গেলে দেরি হয়ে যাবে এবং লোকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়বে। ফলে উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। তার চেয়ে বরং একটি প্রদীন জ্বালিয়ে আমার ও আপনার আঙুল ধুয়ে তাতে প্রবেশ করাই। এতে যার আঙুল পুড়ে যাবে তার ওপর আল্লাহর লা'নত পড়বে অথবা বললাম, সে পরাজিত হবে। আমি এ কথা বললে সে বদলে গেল এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হলো। এ ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো এ বিষয় স্পষ্ট করে তোলা যে, এসব দুষ্ট লোকেরা এ ধরণের গোপন ছল-চাতুরি দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে মিথ্যা কথা পরিবেশন করে।





সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মানুষকে (বিদ্যা) শিখিয়েছেন কলম দ্বারা। শিক্ষা দিয়েছেন এমন বিষয় যা সে জানত না। সকল স্তুতি তাঁর-ই জন্য, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবীর প্রতি, যিনি মনগড়া কিছু বলেন না; যা বলেন আল্লাহর ওহী প্রাপ্তির আলোকেই বলেন।

পরকথা, প্রতিটি মানুষের কর্তব্য তার নবীর পরিচয় জানা। কেননা, আমাদের যে কেউ মারা গেলে তাকে কবরে শোয়ানোর পর তার দেহে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর দু'জন ফিরিশতা আসবেন। তারা তাকে বসিয়ে তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। যেমন, বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিন বান্দাকে কবরে রাখার পরের অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"তার দেহে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তখন তার কাছে দু'জন ফিরিশতা আসবেন। তাকে বসিয়ে তারা জিজ্ঞেস করবেন, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। তারা জিজ্ঞেস করবেন, তোমার দীন কী? সে বলবে, আমার দীন ইসলাম। তারা তাকে বলবেন, তোমার মাঝে প্রেরিত এ ব্যক্তি কে ছিলেন? সে বলবে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারা বলবেন, তুমি তা জানলে কী করে? সে বলবে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি। অতঃপর তাতে ঈমান এনেছি এবং তা সত্যে পরিণত করেছি। তখন আসমান থেকে এক ঘোষক ঘোষণা দেবেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। (মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১৮৫৩৪, হাসান লিগাইরিহী)

অতএব, আমরা জানলাম, যে কেউ পবিত্র কুরআন পড়বে সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় জানতে পারবে। সে আল-কুরআন থেকে জানতে পারবে:

প্রথম: মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ হলেন আল্লাহর রাসূল। আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [الفَتْح : ٢٩]

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল”। [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]

দ্বিতীয়: আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ﴿١٣٦﴾ ﴾ [النِّسَاء : ١٣٦]

“হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ ﴾ [الأَعۡرَاف : ١٥٨]

“সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখেন। আর তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, আশা করা যায় তোমরা হিদায়াত লাভ করবে”। [সূরা আল আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৮]

তৃতীয়: তাঁর রিসালতের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِ ٱلرُّسُلُۚ ﴿١٤٤﴾ ﴾ [آل عِمۡرَان : ١٤٤]

“আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তাঁর পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসূল গত হয়েছেন”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৪৪]

চতুর্থ: তিনি সর্বশেষ নবী।

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব পড়বে, সে জানতে পারবে তাঁর রিসালাত পূর্ব সব আসমানী রিসালাতের পরিসমাপ্তকারী। তাঁর পরে কোনো নবী বা রাসূল নেই। যে কেউ এমন দাবী উত্থাপন করবে সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ ﴿٤٠﴾ ﴾ [الأَحۡزَاب : ٤٠]

“মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়, তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪০]

পঞ্চম: তাঁর রিসালাত পূর্ববর্তী সব ধর্মকে রহিত করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব পড়বে, সে জানতে পারবে যে, তাঁর রিসালাত সব আসমানী রিসালাতকে রহিত করে দিয়েছে। সেহেতু তাঁর নবুওয়তের পরে এসব অনুসরণ করে আমল চলবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ ﴿٤٨﴾ ﴾ [المَائِدَة : ٤٨]

“আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর উপর তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরী‘আত ও স্পষ্ট পন্থা”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ ﴿١٢٠﴾ ﴾ [البَقَرَة : ١٢٠]

“আর ইহুদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের

অনুসরণ কর। বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াত-ই হিদায়াত, আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তারপর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত:১২০]

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, এ উম্মত (উম্মাতুদ দাওয়ার) যে কোন ইহুদী কিংবা খ্রিস্টান আমার নাম শুনবে আর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে ঈমান না এনে মারা যাবে, সে জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হবে"। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩)

আবদুল্লাহ ইবন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমাদের মাঝে মূসা (আ.) থাকতেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করতে, তবে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট হতে। তোমরা উম্মতসমূহের মধ্যে আমার অংশ। আর আমি নবীদের মধ্যে তোমাদের অংশ"। (মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১৫৮৬৪, হাসান লিগাইরিহী সনদে বর্ণিত)

জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন আমার আনুগত্য ছাড়া তারও কোনো উপায় থাকত না"। (মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১৫১৫৬, হাসান লিগাইরিহী সনদে বর্ণিত)

ষষ্ঠ: তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা।

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রাণাধিক ভালোবাসা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾ [التَّوْبَة : ٢٤]

"বল, তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত:২৪]

এ আয়াতের দাবী অনুযায়ী আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ঈমান সঠিক হওয়ার অপরিহার্য শর্ত। আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না আমি তার প্রিয়তম হই তার পিতা, সন্তান এবং সব মানুষের চেয়ে"। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫; সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪৪)

সে ব্যক্তি তো ঈমানের স্বাদই পায় না যে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসে না। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে, সেই ঈমানের প্রকৃত মিষ্টতা অনুভব করবে, (১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্যসব থেকে অধিক প্রিয়। (২) যে কেবলমাত্র আল্লাহর

সন্তুষ্টির জন্যই তাঁর বান্দাকে ভালবাসে। (৩) এবং যাকে আল্লাহ কুফুরী থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তারপর সে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করে, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪৩; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬)

সপ্তম : তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য:

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও অনুকরণ তার জন্য ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ وَأَنتُمۡ تَسۡمَعُونَ ٢٠ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ ٢١﴾ [الأنفال : ٢٠ - ٢١]

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, অথচ তোমরা শুনছ। আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বলে আমরা শুনেছি অথচ তারা শুনে না"। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২০-২১]

সুতরাং যে রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে তার জন্য আনুগত্যও ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ ٦٤﴾ [النِّسَاء : ٦٤]

"আর আমি যে কোনো রাসূল প্রেরণ করেছি তা কেবল এ জন্য, যেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়"। [সূরা আন নিসা, আয়াত: ৬৪]

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ ٨٠﴾ [النِّسَاء : ٨٠]

"যে রাসূলের আনুগত্য করে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করে"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৮০]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"যে আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করে, আর যে আমার অবাধ্যতা দেখায় সে আল্লাহরই অবাধ্য হয়। তেমনি যে আমার নির্বাচিত নেতার আনুগত্য করে সেও আমার আনুগত্য করে, আর যে আমার নেতার অবাধ্যতা দেখায় সে আমারই অবাধ্য হয়"। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৩৫)

যে নবীর আনুগত্য করে সে সুপথ প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْۚ ٥٤﴾ [النُّور : ٥٤]

'আর যদি তোমরা তাঁর (রাসূলের) আনুগত্য কর, তবে হিদায়াত পাবে" [সূরা আন-নূর, আয়াত : ৫৪]

﴿ يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيۡتَنَآ أَطَعۡنَا ٱللَّهَ وَأَطَعۡنَا ٱلرَّسُولَا۠ ٦٦﴾ [الأَحۡزَاب : ٦٦]

"যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেওয়া হবে, তারা বলবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম"! [সূরা আল-আহযাব, আয়াত :৬৬]

অষ্টম : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও তাঁর সমর্থিত বিষয়ের আনুগত্য ওয়াজিব।

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যত কথা, কাজ ও তাঁর সমর্থন করা বিষয় আছে সে সবের আনুগত্য ও অনুকরণ তার জন্য ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨﴾ [الأَعۡرَاف : ١٥٨]

"আর তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর"। [সূরা আল- আ'রাফ, আয়াত : ১৫৮]

সেহেতু যে কেউ আল্লাহকে ভালোবাসে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করবেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١﴾ [آل عِمۡرَان : ٣١]

"বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩১]

নবম : তাঁর আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য :

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করা এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧﴾ [الحَشۡر : ٧]

"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর তোমাদের যা নিষেধ করেন তা বর্জন কর এবং আল্লাহকেই ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর"। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭]

দশম : তাঁর বিপরীত অবস্থান হারাম।

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٦٣﴾ [النُّور : ٦٣]

"অতএব, যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে"। [সূরা আন-নূর, আয়াত : ৬৩]

একাদশ : তাঁর বিরুদ্ধাচরণ হারাম।

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ কিংবা তাঁর কথায় বা কাজের অন্যথা তার জন্য হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥﴾ [النِّسَاء : ١١٥]

"আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১১৫]

দ্বাদশ : তাকে কষ্ট দেওয়া হারাম।

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর আনীত দ্বীন, তাঁর ব্যক্তিত্ব, পরিবার, আত্মীয়বর্গ, সাহাবী ও অনুসারীদের কষ্ট দেওয়া হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابٗا مُّهِينٗا ٥٧﴾ [الأَحۡزَاب : ٥٧]

নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানজনক আযাব। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৫৭]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٦١﴾

[التَّوۡبَة : ٦١]

“এবং যার আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত : ৬১]

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

﴿قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ٦٥ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ إِن نَّعۡفُ عَن طَآئِفَةٖ مِّنكُمۡ نُعَذِّبۡ طَآئِفَةَۢ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ مُجۡرِمِينَ ٦٦﴾ [التَّوۡبَة : ٦٥ - ٦٦]

“বল, ‘আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রুপ করছিলে? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত : ৬৫-৬৬]

ত্রয়োদশ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিষ্পাপ জানা।

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর রিসালাতের কাজে নিষ্পাপ ও নির্ভুল বলে বিশ্বাস করা জরুরি। আল্লাহ তাঁকে মুক্ত করেছেন সব ধরণের ভুল-ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি থেকে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর কোন আলেম-বিজ্ঞানী ভুলের উর্ধ্বে নন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤﴾ [النَّجۡم : ٣ - ٤]

“আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়”। সূরা আন-নাজম, আয়াত- ৩-৪]

﴿ وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِيلِ ٤٤ لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ ٤٥ ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ ٤٦ فَمَا مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ عَنۡهُ حَٰجِزِينَ ٤٧﴾ [الحَاقَّة : ٤٤ - ٤٧]

“যদি তিনি আমার নামে কোনো মিথ্যা রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত পাকড়াও করতাম। তারপর অবশ্যই আমি তার হৃদপিন্ডের শিরা কেটে ফেলতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ-ই তাকে রক্ষা করার থাকত না”। [সূরা আল- হাক্কাহ, আয়াত, ৪৪-৪৭]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْۚ ٥٤﴾ [النُّور : ٥٤]

“আর যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য করো, তাহলে হিদায়াত পাবে। [সূরা আন নূর, আয়াত: ৫৪]

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١﴾ [آل عِمۡرَان : ٣١]

“বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

মালেক ইবন হুয়াইরীছ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা সালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে তোমরা সালাত আদায় করতে দেখ”। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০০৮)

জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তোমরা তোমাদের হজের বিধান জেনে নাও। কারণ, আমি জানি না, সম্ভবত আমার এ হজের পর আমি আর হজ করতে পারব না”। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১২৯৭)

আল্লাহ তাঁকে তাঁর সমর্থনের ব্যাপারেও নিষ্পাপ

বানিয়েছেন। ফলে তিনি কখনো মিথ্যাকে সমর্থন করেন নি কিংবা অবৈধ কিছু দেখে নীরব থাকেন নি। পক্ষান্তরে অন্য সব মনীষীই কখনো কখনো সিদ্ধান্তে ভুল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٦٧﴾ [المَائِدَة : ٦٧]

"হে রাসূল! তোমার কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তা প্রচার করো, যদি তা না কর, তবে তো তুমি তাঁর রিসালাত প্রচার করলে না, আর আল্লাহ মানুষদের থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফের কাওমকে হিদায়াত করেন না"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত : ৬৭]

যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে, জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান ও ভক্তি করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ ٩﴾

[الفَتْح : ٩]

"যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আন, তাকে সাহায্য ও সম্মান কর"। [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ৯]

যে কেউ কুরআন পড়বে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মানের আলামত সম্পর্কে জানতে পারবে। তাঁর সম্মানের বিষয়টিও আল্লাহ-রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত। এটাকে আল্লাহ মানুষের রুচি বা ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দেন নি।

প্রথম আলামত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা ও কাজকে সম্মান করা। তাই তাঁর কথার ওপর কারও কথা কিংবা তাঁর কাজের ওপর অন্য কারও কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١﴾

[الحُجُرَات : ١]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত : ১]

দ্বিতীয় আলামত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা ও কাজের অনুকরণ করা। তাই তাঁর কথার বিপরীতে অন্য কারও কথা কিংবা তাঁর কর্মপন্থার বিপরীতে অন্য কারও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ..

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ٣٦﴾ [الأَحْزَاب : ٣٦]

"আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না, আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে"। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৩৬]

তৃতীয় আলামত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশকে সম্মান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٦٣﴾ [النُّور : ٦٣]

"অতএব, যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে"। [সূরা আন-নূর, আয়াত:৬৩]

চতুর্থ আলামত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিষেধ পরিত্যাগ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَوۡمَئِذٖ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوۡ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلۡأَرۡضُ وَلَا يَكۡتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثٗا ٤٢ ﴾

[النِّسَاء : ٤٢]

"সেদিন আশা করবে যারা কুফরী করেছিল এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল, যদি যমীন তাদের নিয়ে সমান হয়ে যেতো, আর তারা আল্লাহর কাছে কোনো কথাই গোপন করবে না"। [সূরা আন-নিসা : ৪২]

আরও বলেন,

﴿وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلٗا ٢٧ ﴾ [الفُرْقَان : ٢٧]

"সেদিন যালেম ব্যক্তি তার হাত কামড়াতে কামড়াতে বলতে থাকবে, হায় যদি রাসূলের সাথে কোনো পন্থা অবলম্বন করতাম!" [সূরা আল ফুরকান : ২৭]

আরও বলেন,

﴿وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ ۚ ٧ ﴾ [الحَشْر : ٧]

"আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও"। [সূরা হাশর, আয়াত : ৭]

পঞ্চম আলামত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস ও কথাকে সম্মান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ ٢ ﴾ [الحُجُرَات : ٢]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর আওয়াজের ওপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না"। [সূরা আল হুজুরাত, আয়াত : ২]

ষষ্ঠ আলামত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নতকে সম্মান করা এবং দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরা। 'ইরবাদ ইবন সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"(আমার পরে) তোমাদের যে কেউ বেঁচে থাকবে, সে অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তোমরা নবআবিষ্কৃত ধর্মীয় বিষয় থেকে সাবধান। কারণ, তা পথভ্রষ্টতা। তোমাদের যে কেউ এ যুগ পাবে, তার কর্তব্য হবে আমার এবং হেদায়াত ও সুপথ প্রাপ্ত খলীফাদের আদর্শ অবলম্বন করবে এবং তা দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে"। (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৬৭৬)

সপ্তম আলামত : যখনই তাঁর নাম নিজে উচ্চারণ করা হবে বা অন্য কাউকে উচ্চারণ করতে শোনা যাবে, তাঁর ওপর দুরূদ পড়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦ ﴾

[الأَحْزَاب : ٥٦]

"নিশ্চয় আল্লাহ (ঊর্ধ্ব জগতে ফিরিশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর জন্য দো'আ করে। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর ওপর দুরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও"। [সূরা আল আহযাব, আয়াত : ৫৬]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলি ধূসরিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয় আর তখন সে আমার ওপর সালাত পাঠ করে না"। (তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৪৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর সালাত কীভাবে পাঠ করতে হবে তা ওহীর মাধ্যমেই শেখানো হয়েছে। একে মানুষের মর্জি বা রুচির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় নি। আবু মাসউদ

আল আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদের সম্মুখে আগমন করলেন যখন আমরা সা'দ ইবন উবাদার মজলিসে বসা ছিলাম। তখন তাঁর উদ্দেশে বাশীর বিন সা'দ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা তো আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আপনার ওপর দরূদ পড়তে; আপনার ওপর আমরা কীভাবে দরূদ পড়ব? তিনি বললেন, বলো: (উচ্চারণ) 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া'আলা আ-লি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া'আলা আ-লি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ; আল্লাহুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদ কামা বা-রাকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

[অর্থ] হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বংশধরদের ওপর এইরূপ রহমত নাযিল করো, যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ, তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বংশধরদের ওপর বরকত নাযিল করো, যেমন বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়"। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০৫)

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই নিজের কোনো ভালো বা মন্দ করতে সক্ষম নন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ ١٨٨ ﴾ [الأعراف : ١٨٨]

"বল, 'আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান"। [সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ১৮৮]

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যের কোনো ভালো বা মন্দ করতে সক্ষম নন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ٢١ ﴾ [الجن : ٢١]

"বল, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য না কোনো অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি এবং না কোনো কল্যাণ করার।" [সূরা আল জিন্ন, আয়াত: ২১]

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ থেকে 'গায়ব' সম্পর্কে জানতেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ تِلۡكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ نُوحِيهَآ إِلَيۡكَۖ مَا كُنتَ تَعۡلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوۡمُكَ مِن قَبۡلِ هَٰذَاۛ فَٱصۡبِرۡۖ إِنَّ ٱلۡعَٰقِبَةَ لِلۡمُتَّقِينَ ٤٩ ﴾ [هود : ٤٩]

"এগুলো গায়েবের সংবাদ, আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে তা জানাচ্ছি। ইতোপূর্বে তা না তুমি জানতে এবং না তোমার কওম। সুতরাং তুমি সবর কর। নিশ্চয় শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য"। [সূরা হুদ, আয়াত:৪৯]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١٨٨ ﴾ [الأعراف : ١٨٨]

"বল, 'আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমি তো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা

এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে”। [সূরা আল আ‘রাফ, আয়াত : ১৮৮]

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘গায়ব’ সম্পর্কে যা জানতেন তা নবুওয়াত ও রিসালাতের সুবাদে, বিলায়াত বা ওলি হবার কারণে নয়, যেমন ধারণা করে কোনো কোনো সূফী ও তাসাওউফপন্থী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠ ﴾ [الأنعام : ٥٠]

“বল, ‘তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানিনা এবং তোমাদেরকে বলি না যে, আমি একজন ফিরিশতা। আমি কেবল তাই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়’। বল, ‘অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অতএব, তোমরা কি চিন্তা করবে না? [সূরা আল আন‘আম, আয়াত : ৫০]

কিছু কিছু সূফী বলে থাকেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত নয়, বিলায়াতের মাধ্যমে ‘গায়ব’ সম্পর্কে জানতেন, যাতে এ দাবীও করা যায় যে, সূফী-ওলিরাও গায়েব সম্পর্কে অবগত হতে পারেন বিলায়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এমন দাবী নাকচ করতে গিয়ে বলেন,

﴿ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمۡ عَلَيۡهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلۡخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطۡلِعَكُمۡ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجۡتَبِي مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۚ وَإِن تُؤۡمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمۡ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ١٧٩ ﴾ [آل عِمۡرَان : ١٧٩]

“আল্লাহ এমন নন যে, তিনি মুমিনদেরকে (এমন অবস্থায়) ছেড়ে দেবেন যার ওপর তোমরা আছ। যতক্ষণ না তিনি পৃথক করবেন অপবিত্রকে পবিত্র থেকে। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদেরকে গায়েব সম্পর্কে জানাবেন। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মধ্যে যাকে চান বেছে নেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৭৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ٢٦ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدًا ٢٧ ﴾ [الجن : ٢٦ - ٢٧]

“তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া। আর তিনি তখন তার সামনে ও তার পেছনে প্রহরী নিযুক্ত করবেন”। [সূরা আল জিন, আয়াত : ২৬-২৭]

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি শরী‘আত প্রবর্তক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রবর্তিত শরী‘আত অনুসরণকারী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨ ﴾ [الجَاثِيَة : ١٨]

তারপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না”। [সূরা আল জাছিয়া, আয়াত : ১৮]

﴿ وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَاتُنَا بَيِّنَٰتٖ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا ٱئۡتِ بِقُرۡءَانٍ غَيۡرِ هَٰذَآ أَوۡ بَدِّلۡهُۚ قُلۡ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنۡ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلۡقَآيِ نَفۡسِيٓۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۖ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنۡ عَصَيۡتُ رَبِّي عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ ١٥ قُل لَّوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوۡتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ وَلَآ أَدۡرَىٰكُم بِهِۦۖ فَقَدۡ لَبِثۡتُ فِيكُمۡ عُمُرٗا مِّن قَبۡلِهِۦٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ١٦ ﴾ [يُونُس : ١٥ - ١٦]

‘আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে পাঠ করা হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, তারা বলে, ‘এটি ছাড়া অন্য কুরআন নিয়ে এসো। অথবা একে বদলাও’। বল, ‘আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন পরিবর্তনের অধিকার নেই। আমিতো শুধু আমার প্রতি অবতীর্ণ ওহীর অনুসরণ করি। নিশ্চয় আমি যদি রবের অবাধ্য হই তবে ভয় করি কঠিন দিনের আযাবের’। বল, ‘যদি আল্লাহ চাইতেন, আমি তোমাদের উপর তা পাঠ করতাম না। আর তিনি তোমাদেকে এ সম্পর্কে অবহিত করতেন না। কেননা পূর্বে আমি তোমাদের মধ্যে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছি। তবে কি তোমরা বুঝ না?” [সূরা ইউনুস, আয়াত : ১৫-১৬]

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি শরী‘আত প্রবর্তক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আল্লাহর অহীর প্রচারক।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٦٧ ﴾ [المَائِدَة : ٦٧]

‘হে রাসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও আর যদি তুমি না কর, তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না”। [সূরা আল মায়েদা, আয়াত: ৬৭]

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি শরী‘আত প্রবর্তক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আল্লাহর ওহি বা প্রত্যাদেশের ভাষ্যকার। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤ ﴾ [النَّحل : ٤٤]

‘তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা করে”। [সূরা আন নাহাল, আয়াত : ৪৪]

যে কেউ কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করে তাদের ‘আকীদা ও আমল এবং বিশ্বাস ও কর্ম শুদ্ধ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨ ﴾ [الأَعۡرَاف : ١٥٨]

“আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে”। [সূরা আল আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৮]

আরও বলেন,

﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١ ﴾ [آل عِمۡرَان : ٣١]

“বল, ‘যদি তোমরা আল্লহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম

দয়ালু”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

আরও বলেন,

﴿ لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١ ﴾

[الأَحۡزَاب : ٢١]

“অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে”। [সূরা আল আহযাব, আয়াত: ২১]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবাইকে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যথাযথ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!





ইসলামে সালাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন,

ইসলামে সালাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। আল্লাহ্ তা'আলা এর আলোচনা ও মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। কালিমায়ে শাহাদাতের পর সালাতই হল ইসলামের সবচেয়ে বড় রোকন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটিঃ এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, কাবা ঘরের হজ করা এবং রমজান মাসের সিয়াম পালন। (সহীহ বুখারী ১/১১; সহীহ মুসলিম)

সালাত যেহেতু ইবাদতের মূল ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত তাই কুরআন ও হাদীসের অনেক স্থানে সালাত প্রতিষ্ঠা, হেফাযত, সময় মত ধারাবাহিকভাবে তা আদায়ের ক্ষেত্রে বার বার তাগাদা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ ٢٣٨﴾

[البَقَرَة : ٢٣٨]

"তোমরা সালাতসমূহ বিশেষতঃ মধ্য সালাতকে (আসরের সালাত) হেফাজত কর"। [সূরাতুল বাক্বারাহ : ২৩৮]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣﴾ [البَقَرَة : ٤٣]

"এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। (অর্থাৎ জামাতে সালাত আদায় কর) [সূরা বাক্বারাহ : ৪৩]

মৃত্যুর আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ অসিয়ত ছিল সালাত সম্পর্কে। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ উপদেশ ছিল, সালাত সালাত এবং দাস-দাসীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। (সুনানে আবূ দাউদ ১৩/৩৭০)

সালাত সবচেয়ে উত্তম আমল। কারণ, উত্তম আমলের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেনঃ সঠিক সময়ে সালাত আদায়। (সহীহ মুসলিম)

সালাত হল পবিত্রতা ও ক্ষমা কারণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি নদী থাকে এবং তাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বললেন, তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটাই হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্ত। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ গুনাহসমূহ মোচন করে দেন" (সহীহ্ মুসলিম, ৩/১৯৪, বুখারী)

সালাত পাপ ও ভুল-ত্রুটির জন্য কাফ্ফারা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ পর্যন্ত এসব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা হয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়। (সহীহ্ মুসলিম)

সালাত দুনিয়াতে বান্দার নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের জন্য সহায়ক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত আদায় করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশের ওয়াদা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যে বক্তি অবহেলা না করে তা যথাযথভাবে আদায় করবে সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার হল, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন"। (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে সালাত সম্পর্কে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"ক্বিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম সালাত সম্পর্কে বান্দার হিসাব নেওয়া হবে। সালাত যদি সঠিক হয়ে যায় তবে তার সকল আমল ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি সালাতের হিসাব ঠিক না হয় তবে তার সকল আমলের হিসাবও ঠিক হবে না"। (সহীহ ত্বাবারানী)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সালাত হল আলো"। (সহীহ্ মুসলিম)

সালাতে বান্দা তার রব্বের সাথে মুনাজাত (গোপনে আলাপ) করে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, "সালাতকে আমি ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চায় তাকে তাই দিব। বান্দা যখন বলেঃ আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন, আল্লাহ্ বলেনঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে"। (সহীহ্ মুসলিম)

সালাত জাহান্নাম থেকে নাজাত দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"যে ব্যক্তি সূর্য উঠা ও সূর্যাস্তের পূর্বে (ফজর ও আসর) সালাত আদায় করল সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না"। (সহীহ্ মুসলিম)

সালাত কুফরী ও শিরকী থেকে নিরাপত্তা দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় মুসলিম ও কাফের-মুশরিকের মাঝে পার্থক্য হল সালাত ত্যাগ করা"। (সহীহ্ মুসলিম)

জামাতে ফজর ও ইশার সালাত আদায় করলে মুনাফিক্বী থেকে বাঁচা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মুনাফিক্বের উপর সবচেয়ে কঠিক সালাত হল ফজর ও ইশা সালাত। এ দুই সালাতের কি ফযীলত, তা যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা (জামাআতে) উপস্থিত হতো"। (বুখারী ও মুসলিম)

জামাতে সালাত আদায় করা হেদায়েতের পথ। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর মুসলিম অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চায় সে যেন আযান শুনার পর মসজিদে জামাতের সাথে তা আদায়ের মাধ্যমে তার হেফাযত করে। কারণ, আল্লাহ্ তোমাদের নবীর জন্য হেদায়েতের পথ শরীয়ত সম্মত করেছেন। আর যদি তোমরা

নিজেদের বাড়ীতে সালাত আদায় কর, যেমন এ অলস ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে সালাত আদায় করে তাহলে তোমরা নিজেদের নবীর সুন্নাতকে ত্যাগ করবে, আর নবীর সুন্নাতকে ত্যাগ করলে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য যায়, আল্লাহ্ তার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে একটি করে নেকী লিখেন, একটি মর্যাদা উঁচু করেন, একটি গুনাহ মোচন করেন। আমাদের সমাজে দেখেছি মুনাফিক্ব ছাড়া কেউ সালাত থেকে পিছনে থাকত না। অনেক সাহাবী তো দুইজন লোকের কাঁধে ভর করে হলেও জামাতে এসে উপস্থিত হতেন। (সহীহ্ মুসলিম)

অতএব, হে মুসলিম ভাই! আযান শুনার পরই মসজিদ পানে ধাবিত হন। আপনার হাতে যত কাজ আছে ছেড়ে দিন। কারণ, আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও মহান। সর্বদা ওযু অবস্থায় থেকে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। সুন্দরভাবে ওযু করে মসজিদে যেতে বেশী কদম ফেলুন এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করুন।

বিনয় নম্রতা সালাতের প্রাণ, তাই বিনয়ী হয়ে সালাত আদায় করুন। সালাতে যে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তা নিয়ে চিন্তা করুন। সালাতে বিভিন্ন দিকে তাকানো, পোষাক নিয়ে ব্যস্ত থাকা ও শরীর চুলকানো থেকে বিরত থাকুন। কারণ, তা বিনয় ও একাগ্রতা বিরোধী কাজ। রাতে ওযু করে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ুন, যাতে ফজর সালাতের জন্য সহজে জাগতে পারেন। বিতর সালাতের বিষয়ে যত্নবান হোন। সামান্য হলেও রাতে তাহাজ্জুদ সালাত পড়ার চেষ্টা করুন। প্রথম কাতার পেতে আগ্রহী হন এবং সালাতের পর মাসনূন যিকিরসমূহ আদায় করা ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ ﴾ [النِّسَاء : ١٠٣]

"অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন কর, তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন সালাত ঠিক করে পড়। নিশ্চয় সালাত মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে"। [সূরা আন নিসা : ১০৩]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একদা সালাতের গুরুত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে বললেন, "যে ব্যক্তি সালাতের হেফাযত করবে, ক্বিয়ামতের দিন তা তার জন্য আলো, দলীল ও নাজাতের অসীলা হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের হেফাযত করবে না, ক্বিয়ামতে তার কোন আলো, দলীল থাকবে না এবং নাজাতও পাবে না। আর ক্বিয়ামতের দিন কারুন, ফেরআউন, হামান ও উবাই বিন খাল্ফের সাথে তার হাশর হবে"। (মুসনাদে আহমাদ ১৩/৩২৬)

নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করুন। অন্যথায় আপনার পরকালীন বন্ধু হবে কাফের নেতারা!

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, সালাত ত্যাগকারীর হাশর হবে তার অনুরূপ ব্যক্তির সাথে। নেতৃত্ব যাকে সালাত থেকে বিরত রেখেছে তার হাশর হবে ফেরআউনের সাথে। মন্ত্রিত্ব ও চাকুরী যাকে সালাত থেকে বিরত রাখে তার হাশর হবে হামানের সাথে। ব্যবসা-বাণিজ্য যাকে সালাত হতে দূরে রাখে তার হাশর হবে উবাই বিন খালফের সাথে।

যে ব্যক্তি সালাতকে অস্বীকার ও তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ

করে সে কাফের। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মুসলিম ও কাফের-মুশরিকের মাঝে পার্থক্য হল সালাত" (সহীহ্ মুসলিম)।

আর যদি কেউ সালাতের ফরয হওয়া স্বীকার করার পরও অলসতা-অবহেলায় তা ত্যাগ করে তাহলে সে ফাসিক্ব। তার শাস্তি হল মুসলিম শাসক থাকলে তাকে হত্যা করবেন। দেখুন, সহীহুল বুখারী ১/৪২- হাদীস নং ২৪।

বেশীরভাগ উলামা এ বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি বিনা ওযরে এক ওয়াক্ত সালাত ত্যাগ করবে, শাস্তি স্বরূপ মুসলিম শাসক তাকে হত্যা করবেন। পিতামাতার উপর ওয়াজিব হল সাত বছর বয়সে সন্তানদেরকে সালাতের আদেশ দেওয়া। আর দশ বছর বয়সে কোন সন্তান সালাত আদায় না করলে তাকে এজন্য প্রহার করবে। আর এ বয়সে তাদের বিছানা পৃথক করে দিবে।

যারা শুধু শুক্রবারে বা রমযানে সালাত আদায় করে, ইচ্ছাকৃত ফজর সালাত বিলম্বে আদায় করে বা ছেড়ে দেয় তারা কঠিন ও ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হবে। এরূপ করা কোন ক্রমেই জায়েয নয়। অতএব, সাবধান হে মুসলিমগণ! সাবধান!!

মুক্বীম তথা স্থায়ী বাসিন্দার উপর মুসলমানদের জামাতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣﴾ [البَقَرَة : ٤٣]

"এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। অর্থাৎ মসজিদে জামাতে সালাত আদায় কর"। [সূরা আল বাক্বারাহ ৪৩]

আল্লাহ যেন আমাদেরকে পাঁচওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে নিয়মিত ও সঠিকভাবে আদায় করার তাওফীক দান করেন। বেনামাজীদেরকে হেদায়াত দান করেন। আমীন!





আবার সালাত আদায় করো, তোমার সালাত হয়নি

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করল। অতঃপর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকটে এসে তাকে সালাম করলে রাসূল তার সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন,

"তুমি ফিরে যাও এবং পুনরায় সালাত আদায় কর, কারণ, তোমার সালাত হয়নি। অতঃপর লোকটি সালাত আদায় করল। সালাত শেষে রাসূলের কাছে এসে তাকে সালাম জানাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও বললেন, তুমি আবার ফিরে যাও এবং সালাত আদায় কর। কারণ তোমার সালাত আদায় হয়নি। এভাবে তিনি তিনবার বললেন। লোকটি বলল, যে সত্তা আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তার শপথ! আমি এর চেয়ে উত্তমরূপে আদায় করতে সক্ষম নই। সুতরাং আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি এরশাদ করলেন, যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে, প্রথমে তাকবীর দিবে। তারপর কুরআন থেকে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে। এরপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে এবং রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। এরপর সিজদা থেকে উঠে স্থিরভাবে বসবে এবং পুনরায় সিজদায় গিয়ে স্থিরভাবে সিজদা করবে। তারপর পূর্ণ সালাত এভাবে আদায় করবে। (বুখারী-৭৫৭ ও মুসলিম- ৩৯৭)

হাদিসের শব্দ প্রসঙ্গে:

فَدَخَلَ رَجُلٌ ব্যক্তিটি ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবি খাল্লাদ বিন রাফে (রা.)।

فَصَلَّى তার আদায়কৃত সালাত ছিল تحية المسجد হিসেবে।

ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ অর্থাৎ পুনরায় সালাত আদায় কর। কারণ, তোমার আদায় করা সালাত সঠিক নিয়মে হয়নি।

ثُمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ معكَ مِنَ القُرْآنِ আহলে ইলমের অধিকাংশের মত এই যে, হাদিসের এ অংশের দ্বারা উদ্দেশ্য হল সুরা ফাতেহা। হাদিসটির বর্ণিত ভিন্ন রেওয়ায়েত বিষয়টিকে আরো জোরাল করে। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে।

ثُمَّ اقْرَأْ بأمّ القرآن وبما شاءَ অতঃপর তুমি সূরা ফাতিহা ও সাথে যা ইচ্ছা তা পাঠ কর।

আহকাম ও ফায়দা :

১. হাদিসবেত্তাগণ একে حديث المسيء في صلاته (সালাতে যে ভুল করেছে সে সম্পর্কিত হাদিস) নামে নামকরণ করেছেন। কারণ, হাদিসটিতে বর্ণিত আছে যে, লোকটি বারবার সালাতে ভুল করছিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পুনরায় আদায় করতে আদেশ দিচ্ছিলেন।

২. হাদিসটি প্রমাণ করে যে, সালাতের প্রতি রাকাতে ক্বেরাত পাঠ ওয়াজিব। (বুখারী- ৭৫৭ ও মুসলিম-৩৯৭)

৩. উবাদা ইবনে ছামেত (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস বিষয়টিকে আরো দৃঢ় করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন:

"কোরআনের সূরা ফাতেহা যে পাঠ না করবে, তার সালাত হবে না"। (বুখারী-৭৫৬)

৪. ধীরস্থিরতা সালাতের অন্যতম রুকন। ধীরস্থিরতা ব্যতীত সালাত বিশুদ্ধ হতে পারে না।

এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে পুনরায় সালাত আদায়ের আদেশ দিচ্ছিলেন। সে বারংবার এ বিষয়টিতে ভুল করছিল। ধীরস্থিরতা দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে আসা এবং সালাতে ওয়াজিব দোয়া পাঠ করা। ক্বিয়াম, রুকু, রুকু হতে উঠা, সেজদা, সেজদা হতে উঠা, তাশাহহুদের জন্য বসা ইত্যাদি সালাতের যাবতীয় কর্মে এই ধীরস্থিরতা আবশ্যক। অন্যথায় সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। (বুখারী-৭৫৭ ও মুসলিম-৩৯৭)

৫. উক্ত হাদিসে যে সমস্ত রুকনের উল্লেখ পাওয়া যায়, সালাতের প্রতি রাকাতে সমভাবে তা ওয়াজিব। তবে তাকবীরে তাহরীমা এর ব্যতিক্রম। কারণ, তা শুধু প্রথম রাকাতের রুকন।

৬. যে জানে না, বুঝে না, অথবা গাফেল তাকে শিক্ষা প্রদানের জন্য হাদিসটিতে উৎসাহব্যঞ্জক দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। তবে, শর্ত এই যে, শিক্ষা প্রদান হতে হবে বিনয়-বিনম্রতার সাথে, স্পষ্টভাবে; কঠোরতা ও জোরজবরদস্তি ব্যতীত।

৭. হাদিসের মাধ্যমে আমরা ছাত্র ও শিক্ষার্থীর যে সমস্ত গুণ ও আদবের পরিচয় পাই, তা এই যে-

শিক্ষকের প্রতি পরিপূর্ণ উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে মনোসংযোগ স্থাপন, যাতে শিক্ষক হতে সর্বোচ্চ উপকারিতা অর্জন সম্ভব হয়। হাদিসে বর্ণিত সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি নিয়োগ করেছিলেন পরিপূর্ণ মনোসংযোগ, যাতে তার সালাত পূর্ণাঙ্গ ও উৎকর্ষমন্ডিত হওয়ার উপকরণগুলো রাসূলের কাছ থেকে ভালোভাবে শিখে নিতে পারে।

যথোপযুক্ত শিষ্টাচার প্রদর্শন ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রতি সম্মান মর্যাদ দান, যাতে শিক্ষক তাকে যা শিক্ষা দানে প্রয়াসী ও অভিপ্রায়ী, তা পূর্ণাঙ্গরূপে আয়ত্ব করা সম্ভব হয়।

শিক্ষক যা শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন, শিক্ষার্থীর নিকট যদি তা অস্পষ্ট থাকে, তবে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা করা। শিক্ষকের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থী যখন উপলব্ধি ও আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম না হবে তখনো এ অভ্যাসের গুরুত্ব অতীব। আল্লামা মুজাহিদ (রহ.) মন্তব্য করেন-

لا يتعلم العلمَ مستحٍ ولا مستكبر

(শিক্ষাক্ষেত্রে) লাজুক বা অহংকারী ইলম শিখতে পারে না। (যাদুদ দায়িয়াহ:২০)

জ্ঞানী বা শিক্ষক তার ছাত্রদের সামনে যা উপস্থাপন করেন, তার মাঝে সবচেয়ে উপকারী ও কল্যাণকর হচ্ছে উপদেশ প্রদান। তবে তা অবশ্যই হতে হবে প্রথম শিক্ষক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুকরণে, তাঁরই বর্ণিত পথ ও পদ্ধতি অনুসারে।

শিক্ষাদান পদ্ধতি বৈচিত্রময় হতে হবে। প্রশ্নোত্তর পর্ব আলোচনাকে এমনভাবে উপস্থাপন করবে, যা শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে সুসমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

হাদিসটি দ্বারা তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায়ের বিষয় পাওয়া যাচ্ছে। হাদিসটিতে আছে যে, সাহাবি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন। উত্তমরূপে আদায় হয়নি বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বারংবার আদায়ের নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

সালাম প্রদান। যদিও একবার সালাম প্রদানের পর দু'ব্যক্তির মাঝে সময়ের তারতম্য হয় খুবই সামান্য ও স্বল্প।

পরিশেষে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তম আচরণ প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। এর প্রতিটি বাক্যে ফুটে উঠেছে রাসূলের সুষমামণ্ডিত আচার ও সামাজিকতা। সাহাবীদের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই সামাজিক আচরণের অনুবর্তী, সহনশীল ও ভালবাসাপ্রবণ। সুতরাং, শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের একান্ত অনুসরণ কাম্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ ﴾ [الأَحْزَاب : ٢١]

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব: ২১)





হিদায়াতের আলোকরশ্মি

মুমিন যতই পাপ করুক না কেন, তার অন্তরে সর্বদা হিদায়াতের আলো লুকায়িত থাকে। সময় সুযোগে তাকে সজাগ করতে পারলে ঠিকই সে ভালো আমল করার জন্য তৈরি হয়ে যায়। আমার জীবনের বাস্তব একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি, যা থেকে মুমিন বান্দাগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। ঘটনাটি নিম্নরূপ:

একদা আমি বিমানে সফর করছিলাম। কতিপয় ভ্রান্ত ও বখাটে যুবকের পাশে। তাদের সিগারেটের ধোঁয়ায় বিমানের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তাদের হাসি-তামাশায় পরিবেশ ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। বিমানটিও ছিল যাত্রীতে পরিপূর্ণ। ফলে সিট পরিবর্তন করতে পারলাম না। ভাবছিলাম কিভাবে এ দূরাবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। অনেক ভেবে-চিন্তে কুরআনুল কারীম হাতে নিয়ে মৃদু আওয়াজে পাঠ করতে শুরু করলাম। অল্প সময়ের মধ্যে যুবকদল থেমে গেল। কেউ কেউ নিদ্রা যেতে লাগল। আবার কেউ বা খবরের কাগজ পাঠ করতে আরম্ভ করল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আমার ডান পার্শ্ব থেকে এক যুবক উচ্চস্বরে বলে উঠল, যথেষ্ট হয়েছে, এবার রাখুন। মনে করলাম আমার আওয়াজে হয়ত তার কষ্ট হচ্ছে। তাই ক্ষমা চেয়ে আবার নিঃশব্দে পড়া শুরু করলাম, যাতে কারো ডিস্টার্ব না হয়। দেখতে পেলাম ছেলেটি মাথা নীচু করে গভীর চিন্তায় মগ্ন আছে। শুধু তাই নয়, সিটে বসে রীতিমত হেলতে আরম্ভ করেছে। অতঃপর আমার নিকট এসে বিনয় সহকারে বলল, অনুগ্রহপূর্বক এই পর্যন্ত ক্ষান্ত করুন, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

অতঃপর ছেলেটি সিট ছেড়ে দিয়ে কাছে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করল এবং বলল, আমি ক্ষমা চাচ্ছি, আমি ক্ষমা চাচ্ছি। একথা বলে সে চুপ হয়ে গেল। কী জবাব দেব ভাবতে পারলাম না। অশ্রু ভরা চোখে বলল, হায় আফসোস বিগত তিন বছর যাবত আল্লাহর জন্য একটি সাজদাও করিনি। আর তাঁর কালামের একটি আয়াতও পাঠ করিনি। গত এক মাস ধরে ভ্রমণে আছি। এমন কোন অপরাধ নেই যা আমি করিনি। যখন

আপনাকে দেখতে পেলাম, তখন মনে করলাম, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, দুঃশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়লাম ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। আমার হৃদয়ে প্রতিটি আয়াত তীরের মতো বিঁধতে লাগল। মনে মনে বললাম, আর কতদিন বোকা হয়ে বসে থাকব? এ অন্ধকার থেকে কী করে মুক্তি পাওয়া যাবে? মিথ্যে ও পাপের পরিণাম কী হবে? অতঃপর বিশ্রামাগারে চলে গেলাম। আপনি কী জানেন কেন গিয়েছি? তা এ জন্য যে, আমি দুঃশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ে চিৎকার করতে চাইলাম। কিন্তু ঐ রুমটি ছাড়া মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল হওয়ার মতো আর কোনো জায়গা পেলাম না।

লেখক (আহমদ বিন আব্দুর রহমান) বলেন, আমি তাকে তওবা ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের কথা বললাম। সে চুপ রইল। যখন বিমান অবতরণ করল তখন সে আমাকে তার বন্ধুদের থেকে একটু আড়ালে নিয়ে বলল, আপনি কী মনে করছেন আল্লাহ তা'আলা আমার তওবা কবুল করবেন? জবাবে বললাম, যদি তুমি সত্যিকারার্থে তাওবা কর, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন। এবার সে বলল, আমি অনেক বড় বড় অপরাধ করেছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী শ্রবণ করনি?

﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣﴾ [الزُّمَر : ٥٣]

"তুমি বল, 'হে আমার ঐ সকল বান্দা, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় তিনি সব গুণাহ ক্ষমা করে দিবেন। কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত : ৫৩]

সে একথা শুনে খুশি হল ও মৃদু হাসল। এদিকে তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। কাঁদতে কাঁদতে সালাম দিয়ে চলে গেল।

হে আমার মুসলিম ভাই! মানুষ বক্র পথে গিয়ে যত পাপই করুক না কেন, অবশ্যই তার অন্তরে একটি কল্যাণের বীজ সুপ্ত থাকে। যখন আমরা সে বীজ পর্যন্ত পৌঁছে তাতে পানি সেচন করে ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারব, তখন তা গজিয়ে উঠবে। অতএব, গুণাহের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেও প্রত্যেকের অন্তরে কিছু কল্যাণের বীজ সুপ্ত থেকে যায়। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দার মঙ্গল চান তখন তার আত্মাকে হিদায়াতের রশ্মি দ্বারা আলোকিত করে সরল পথের সন্ধান দেন। আল-কুরআনে এসেছে,

﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشۡرَىٰ لَكُمۡ وَلِتَطۡمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦۚ وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ ١٢٦﴾ [آل عِمۡرَان : ١٢٦]

"আল্লাহ তা'আলা তা কেবল তোমাদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ পাঠিয়েছেন এবং যাতে তোমাদের আত্মা সান্তনা পায়। মূলত: সাহায্য তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাপূর্ণ আল্লাহর পক্ষ থেকেই"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১২৬]



কল্যাণকর কাজে উদ্বুদ্ধকারী কিছু হাদীস

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। সওয়াব অর্জনের ক্ষেত্র অনেক এবং ভাল ও উত্তম কাজের প্রতিদান বিরাট।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মহান প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ভাল ও মন্দ উভয়টিকে লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করে অথচ তা এখনও বাস্তবে পরিণত করেনি, তার জন্য আল্লাহ নিজের কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন"। (বুখারী ৬০১০, মুসলিম ১৮৭, ২৪৬)

যে ব্যক্তি নেকির কাজে নির্দেশ প্রদান করবে এবং এ কাজের জন্য উপদেশ ও পথ প্রদর্শন করবে তার জন্য বিরাট সওয়াব রয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে ডাকে তার জন্য এ পথের অনুসারীদের বিনিময়ের সমান বিনিময় রয়েছে। এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকে, তার উক্ত পথের অনুসারীদের গুনাহের সমান গুনাহ হবে, এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কম হবে না।" (মুসলিম, হাদীস নং-৪৮৩১)

নীচের হাদীসগুলোতে সওয়াবের কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করা হল ঃ

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার এই ওজুর ন্যায় ওজু করার পর একাগ্রচিত্তে দু'রাকাত (নফল) নামাজ পড়বে এবং অন্য কোন ধারণা তার অন্তরে উদয় হবে না, তার পূর্বকৃত সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (বুখারী ১৫৯, মুসলিম-৩৩১)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি দিন ও রাতে নিয়মিত বারো রাকাত নামাজ পড়বে, তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করা হবে। (নামাজগুলো হলো) যোহরের ফরজের আগে চার রাকাত ও পরে দু'রাকাত, মাগরিবের ফরজের পরে দু'রাকাত, এশার ফরজের পরে দু'রাকাত এবং ফজরের ফরজের পূর্বে দু' রাকাত। (সহীহ মুসলিম, সহীহ আত্ তারগীব ৪৮০)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি জামাতে ফরজ নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, সে হজ আদায় করার সওয়াব পায় এবং যে ব্যক্তি কোন নফল নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে যায় সে উমরা আদায় করারা সওয়াব পায়" (সহীহ আল জামে- ৭৫৫৬)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়ল সে মহান আল্লাহর জিম্মা বা রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হলো। আর আল্লাহ যদি তার নিরাপত্তা প্রদানের হক কারো থেকে দাবি করে বসেন তাহলে সে আর রক্ষা পাবে না। তাই তাকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।" (সহীহ আল জামে-২৮৯)

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামাজ পড়ার জন্য পরিপূর্ণরূপে ওজু করে ফরজ নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যায় এবং লোকদের সাথে নামাজ আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন"। (ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ আল জামে ৬১৭৩)

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন প্রথম তাকবীরের সাথে জামাতে নামাজ আদায় করবে তার জন্য দু'টি অব্যাহতি ও নিষ্কৃতি লেখা হয়। একটি অব্যাহতি হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং আর একটি হলো মুনাফেকি বা দ্বিমুখী থেকে নিষ্কৃতি"। (আস সহীহ-১৯৭৯)

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানের লাশের সাথে গেল এবং তার জানাজার নামাজ পড়া ও তার দাফন কাজ শেষ করা পর্যন্ত তার সাথে থাকল, সে দু' কিরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কিরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি মৃতের জানাজা পড়ে তাকে দাফন করার আগে ফিরে আসবে, সে এক কিরাত নিয়ে ফিরবে।" (সহীহ আততারগীব-৩৯৪৮, বুখারি, হাদীস নং- ৯৩০)

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি এই (কা'বা) ঘরের হজ করল, তার মধ্যে সে অন্যায় ও অশ্লীল আচরণ করেনি, সে নিজের গুনাহ থেকে এমনভাবে ফিরে আসবে যেমনভাবে তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল"। (সহীহ নাসায়ী-২৪৬৪)

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি (কা'বা) ঘরের (সাতবার) তওয়াফ করবে এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে সে এক ক্রীতদাস আজাদ করার সওয়াব অর্জন করবে"। (আসসহীহাহ-২৭২৫)

১০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি (ইসলামের পথে) শাহাদাতের আগ্রহ পোষণ করে তাকে সেই মর্যাদা দেয়া হয়, যদি সে নিহত নাও হয়"। (সহীহ আত্ তারগীব-১২৭৭)

১১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিল এবং তার গোপনীয়তা রক্ষা করল, তাহলে মহান আল্লাহ উক্ত ব্যক্তিকে (গুনাহ থেকে) ঢেকে রাখবেন এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাফন পড়িয়ে দিল আল্লাহ তা'আলা (জান্নাতে) তাকে পাতলা রেশমি বস্ত্র পরিধান করাবেন"। (আস্ সহীহা- ২৩৫৩)

১২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ঈমানদার পুরুষ এবং নারীর ক্ষমা প্রার্থনার বিনিময়ে একটি করে নেকি লিখে দিবেন"। (আস্ সহীহাহ ৬০২৬)

১৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পড়বে তার জন্য একটি সওয়াব আছে। আর একটি সওয়াব হল তার দশ গুণ হিসেবে। আমি বলি না যে, "আলিফ-লাম-মীম" একটি হরফ বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ"। (আস্ সহীহাহ-৩৩২৭)

১৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি দিবসে একশত বার سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ (আল্লাহ পূত ও পবিত্র এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা) পাঠ করে তার পাপসমূহ মুছে ফেলা হয়, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির সমান হয়ে থাকে"। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

১৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে সকালে উঠে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপরে দরুদ পাঠ করে, কেয়ামতের দিবসে সে আমার শাফাআত পাবে"। (সহীহ আল-জামে' ৬৩৫৭)

১৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরি করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে এর চেয়ে প্রশস্ত একটি ঘর তৈরি করবেন"। (আস সহীহাহ-৩৪৪৫)

১৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وبِحَمْدِهِ (মহান আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসাও বর্ণনা করছি) বলবে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে"। (আস সহীহাহ-৬৪)

১৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি দিবসে এই দু'আ পড়বে-

لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া কোন (হক্ব) ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল"। সে ব্যক্তি দশজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ করবে। আর তার জন্য একশত সওয়াব লেখা হবে এবং তার একশতটি গুনাহ মাফ হবে। উক্ত দিবসের সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের (প্ররোচনা ও বিভ্রান্তি) থেকে তাকে সুরক্ষিত রাখা হয়। কেউ নেই যে এই দুআটি পাঠকারীর চেয়ে উত্তম কোন দুআ পাঠে উক্ত মর্যাদা লাভ করতে পারে, তবে যে এর চেয়ে অধিক পাঠ করবে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ-৩০৬৪)

১৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে"। (সহীহ মুসলিম)

২০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন রোগাক্রান্ত বা বিপদে পতিত লোককে দেখে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে সে উক্ত বিপদে আক্রান্ত হবে না।"

الحمدُ للهِ الذي عافَانِي مِمَّا ابْتلاكَ به، وفَضَّلَنِي على كَثِيرٍ مِمَّنْ خلق تَفضِيلًا

অর্থ : "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে যে পরীক্ষায় নিপতিত করেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির অনেকের চেয়ে আমাকে অধিক অনুগ্রহ দান করেছেন"। (আস সহীহাহ-৬০২)

২১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি দশবার নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে, সে ইসমাইল (আ.) এর বংশের একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব পাবে।

لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি

একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল"। (সহীহ আল জামে-৪৬৫৩)

২২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার রহমত অবতীর্ণ করবেন"। (সুনানে তিরমিজি-৪০২)

২৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আনসারগণকে ঈমানদার ছাড়া কেউ ভালোবাসে না এবং তাদের সাথে মোনাফিক ছাড়া কেউ শত্রুতা করে না। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন এবং যে ব্যক্তি তাদের সাথে শত্রুতা রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে শত্রুতা রাখেন।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

২৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্থকে সুযোগ দিল অথবা তার ঋণ মাফ করে দিল, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ার নীচে আশ্রয় প্রদান করবেন, যেদিন উক্ত ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না"। (সুনান আত্ তিরমিজি-১০৫২)

২৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের (দোষ) গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার (দোষ) গোপন রাখবেন"। (বুখারী-২২৬২, মুসলিম-৪৬৭৭)

২৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তির ঘরে তিনটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করল, অতঃপর উক্ত কন্যা সন্তানদের প্রতি সে সহনশীল হলো এবং ঐকান্তিকতার সাথে তাদেরকে ভরণ-পোষণ করল, কিয়ামতের দিন উক্ত কন্যা সন্তানেরা তার জন্য জাহান্নাম থেকে প্রতিবন্ধক পর্দা হবে"। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

২৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার অন্য মুসলমান ভাইয়ের গীবতের মাধ্যমে অমর্যাদা করা থেকে দূরে থাকল, আল্লাহর প্রতি উক্ত বান্দার হক হলো যে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা"। (সহীহ আত্ তারগীব-২৮৪৭)

২৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ক্রোধকে সংবরণ করল অথচ উক্ত ক্রোধকে সে বাস্তবায়নে সক্ষম, আ'আলা কিয়ামতের মাঠে সমস্ত জীবের সামনে তাকে আহ্বান করবেন এবং যতটি ইচ্ছে ততটি বেহেশতের হুর বেছে নেয়ার সুযোগ তাকে দেবেন। (সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ)

২৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেন"। (সিলসিলা আস সহীহাহ-২৩২৮)

৩০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিজিক বৃদ্ধি পাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে"। (বুখারী ৪৬৩৯)

৩১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন গিরগিটিকে (মুহূর্তে রং পরিবর্তন করার ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষ প্রাণী) প্রথম আঘাতে হত্যা করল তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আঘাতে হত্যার জন্য এর চেয়ে কম নেকী লেখা হবে"। (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আমলগুলো পালনের মাধ্যমে আমাদেরকে অধিকহারে সওয়াব অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন!!



যাদের জন্য জান্নাতের বাড়ি বরাদ্দ

আবু উমামা আল বাহেলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের তৃতীয় শ্রেণিতে একটি বাড়ির জিম্মাদার যে কলহ বিবাদ পরিত্যাগ করে। যদিও সত্য তার পক্ষেই হয়। আর ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের দ্বিতীয় শ্রেণিতে একটি বাড়ির জিম্মাদার, যে মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে। যদিও তা হাসি-তামাশার ছলে হয়। আর ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের প্রথম শ্রেণিতে একটি বাড়ির জিম্মাদার, যে সৎ চরিত্র ও আদর্শবান”। (আবু দাউদ, সনদটি হাসান)

হাদিস বর্ণনাকারীঃ বর্ণনাকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশিষ্ট সাহাবী। নাম সাদি বিন আজলান আল-বাহেলি। উপনাম আবু উমামা। পিতার নাম আজলান, বাহেল নামক স্থানের অধিবাসী হওয়ার ফলে তাকে বাহেলী বলা হয়। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার সংগ্রহ করেছিলেন। ৮১ মতান্তরে ৮৬ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আভিধানিক ব্যাখ্যা ঃ

زَعِيْمٌ : জিম্মাদার, দায়িত্বভার বহনকারী।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ এবং আমি তার জিম্মাদার। (সূরা ইউসুফ ৭২)

بِبَيْتٍ : বালাখানা, জান্নাতের প্রাসাদ।

رَبَضِ الْجَنَّةِ : এখানে ر ও ب বর্ণে জবর হবে। অর্থ নীচের স্তরের বা তৃতীয় শ্রেণির।

الْمِرَاءَ : এর م বর্ণে যের হবে। অর্থ কলহ-বিবাদ।

مُحِقًّا : অর্থ, তার ধারণা সে হকের উপর রয়েছে।

الْكِذْبَ : মিথ্যা, তথা বাস্তবের বিপরীত।

হাদিসের শিক্ষণীয় বিষয় :

১। সফল আহ্বায়ক ও অভিভাবক সেই ব্যক্তি যে তার কথাগুলো এমন কৌশলে শ্রোতাদের নিকট উপস্থাপন করে যে, শ্রোতাবৃন্দ তার প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে। উপরোক্ত হাদীসে যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুপ্রাণিত করেছেন।

২। জান্নাত হল প্রত্যাশীদের সর্বোচ্চ প্রত্যাশা এবং

প্রতিযোগীদের সর্বাধিক প্রতিযোগিতার বিষয়। সফলকাম সে যে জান্নাত লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। ভাগ্যবান সে যে তা অর্জনের জন্য অধিক পরিমাণে নেক আমল করে। জান্নাত অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ, তা অর্জন করা শুধু তার জন্যই সহজ হয়, যার জন্য ঐশীভাবে বিষয়টি সহজ করা হয়।

৩। জান্নাত আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাদের জন্য তৈরি করেছেন এবং বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। বর্ণিত হাদিসে সে সব লোকদের জান্নাতের শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে, যারা উপযুক্ত তিনটি গুণে গুণান্বিত।

(ক) অনর্থক কলহ বিবাদ থেকে দূরে থাকা:

এরূপ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের উপকণ্ঠে তৃতীয় শ্রেণি বরাদ্দ। কেননা কলহ বিবাদ মানুষকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য করে ও পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। ফলে তাকে মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে অক্ষম করে দেয়। সুতরাং প্রকৃত মুসলমান সব ধরণের কলহ বিবাদ পরিহার করে চলে।

(খ) মিথ্যা থেকে দূরে থাকা : হোক তা উপহাসমূলক। এ গুণে অলংকৃত ব্যক্তির জন্য জান্নাতের দ্বিতীয় শ্রেণির বাড়ির শুভ সংবাদ রয়েছে। এ ব্যক্তি এহেন সম্মানে ভূষিত হওয়ার কারণ এই যে, সে কথা ও কাজে মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে সর্বদা সত্যের উপর স্থির থাকে। যখন কথা বলে, তখন সত্যই বলে। আর যখন কোন সংবাদ প্রচার করে তখন সত্য সংবাদই প্রচার করে। মিথ্যা একটি জঘন্য অপরাধ। তাই মিথ্যা কপটতার লক্ষণসমূহের মাঝে অন্যতম। যেমন আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "মুনাফিক্বের লক্ষণ তিনটি ঃ (১) মিথ্যা বলা, (২) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও (৩) আমানতের খেয়ানত করা বা গচ্ছিত বস্তুতে হস্তক্ষেপ করা"। (বুখারী ৩২)

মিথ্যা কবীরা সমূহের অন্যতম। মিথ্যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিরাট ক্ষতির উদ্রেককারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাক। কেননা মিথ্যা অপকর্মের উৎস। আর অপকর্মের পরিণাম হল জাহান্নাম। পৃথিবীতে এমন কিছু লোক আছে, যারা খুব মিথ্যা বলে। মিথ্যা বলায় সদা সচেষ্ট থাকে। পরিশেষে আল্লাহর নিকট মিথ্যুক বলে লিখিত হয়ে যায়"। (সহীহ মুসলিম- ৪৭২১)

মিথ্যা সম্পর্কে উপযুক্ত সতর্ক বাণী, যা প্রতিটি মিথ্যুকের জন্য প্রযোজ্য। যদিও এ মিথ্যা শুধু উপহাস করার জন্য বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ধ্বংস সে ব্যক্তির জন্য যে লোক হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস। সবচেয়ে জঘন্য মিথ্যা কথা হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যা বলা। এমনিভাবে সম্পদের জন্য মিথ্যা কথা বলা।

(গ) সৎ চরিত্র ও উত্তম আদর্শ ব্যক্তির জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়: এ গুণে অলংকৃত ব্যক্তির জন্য রয়েছে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর প্রথম শ্রেণির বাড়ির শুভ সংবাদ। যেহেতু এই বক্তি এক মহৎ গুণের অধিকারী, আর তা হল সৎ চরিত্র ও উত্তম আদর্শ, যা ছিল নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ গুণ। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ ﴾ [القلم : ٤]

আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (সূরা কলম-৪)

এই মহান চরিত্রই হল সর্ব উৎকৃষ্ট গুণ, যা মুসলমানদের জন্য জগতবাসীর কাছে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও পরকালে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম উপায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কেয়ামতের দিন যে সব আমল ওজন করা হবে তার মাঝে সবচেয়ে বেশি ওজনী আমল হবে সৎ চরিত্র বা উত্তম আদর্শ। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট যে অশালীন ও অসৎ চরিত্রবান"। (তিরমিযি-১৯২৫)

(৪) ইসলামের দাবি হল মুসলিম সমাজের প্রতিটি মানুষের মাঝে বিরাজ করবে মায়া-মমতা, আন্তরিকতা, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের সুসম্পর্ক। যেখানে থাকবে না কোন প্রকার হিংসা বিদ্বেষ ও কুরুচিকর কর্মকান্ড।

(৫) ইসলামের মূলনীতির অন্যতম হল ভাল বস্তুর উপকার দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেয়ে মন্দের অপকারিতা থেকে বাঁচার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা। সুতরাং যে কলহ বিবাদ মানুষকে সমস্যার সম্মুখীন করবে, তা হতে দূরে থাকাই উচিত।





সাহাবীগণের মর্যাদা

‘সাহাবী’ দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে? তাদের ব্যাপারে আমাদের কী আকীদা পোষণ করা উচিত?

আরবীতে ‘সাহাবাহ’ (صحابة) শব্দটি ‘সাহাবী’ (صحابي) শব্দের বহুবচন। সাহাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি মুমিন থাকা অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ঈমানের ওপর মারা গিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে আমাদের এ আক্বীদা পোষণ করা ওয়াজিব যে, তারা উম্মতের অগ্রবর্তী দল এবং তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহচর্য লাভ, তাঁর সাথে জিহাদ করা, তাঁর থেকে শরী‘আত গ্রহণ করে পরবর্তীদের জন্য তা প্রচার করার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় গ্রন্থ আল কুরআনে তাদের প্রশংসা এভাবে করেছেন,

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ ﴾ [التَّوْبَة : ١٠٠]

“মুহাজির ও আনসারদের প্রথম অগ্রবর্তী দল এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এটাই মহা সাফল্য। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত- ১০০]

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾ [الفَتْح : ٢٩]

‘মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্ট কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের বর্ণনা হল যেমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।” [সূরা আল ফাতহ, আয়াত:২৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٩﴾ [الحَشر: ٨ - ٩]

“এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী। আর এ সম্পদ তাদের জন্যও, যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে। তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।” [সূরা আল হাশর, আয়াত: ৮,৯]

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা মুহাজির এবং আনসারদের প্রশংসা করেছেন যারা সবার আগে কল্যাণের প্রতি অগ্রসর হয়েছে। আর এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাদের জন্য জান্নাতসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাদের সম্পর্কে আরো বলেছেন যে, তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, বেশি বেশি রুকু ও সাজদারত, সৎ হৃদয় সম্পন্ন। তাদের চেহারায় ঈমান ও আনুগত্যের চিহ্ন রয়েছে, যা দ্বারা তাদেরকে চেনা যায়। আল্লাহ স্বীয় নবীর সাহচর্য লাভের জন্য তাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। যাতে তাদের দ্বারা স্বীয় শত্রু কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। অধিকন্তু মুহাজিরদের বর্ণনায় তিনি বলেছেন, তারা শুধু আল্লাহর জন্য তাঁর দীনের সাহায্যার্থে এবং তাঁর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজেদের মাতৃভূমি ও সহায়- সম্পদ ত্যাগ করেছেন, এ কাজে তারা ছিলেন সত্যাশ্রয়ী। আনসারদের বৈশিষ্ট্য তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তারা হিজরতের আবাসস্থল এবং নুসরত তথা সহযোগিতা ও সত্যিকার ঈমানের আবাস ভূমির বাসিন্দা। তাদের সম্পর্কে এও বলেছেন যে, তারা তাদের মুহাজির ভাইদেরকে ভালবাসে, নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, তাদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করে এবং তারা কৃপণতা থেকেও মুক্ত। এভাবেই তারা সফলতা অর্জন করেছে।

এগুলো হলো সাহাবীগণের কিছু গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য যা তাদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ছাড়াও তাদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা ছিল। যদ্বারা তারা একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। আর এ শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয়েছে ইসলাম, জিহাদ ও হিজরতের প্রতি তাদের অগ্রে অংশ গ্রহণের অনুপাতে।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন চার খলীফা, আবু বকর, উমার, উসমান এবং আলী (রা.)। এরপর স্থান হলো জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর অবশিষ্ট সাহাবীগণ। তারা হলেন তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবনু যায়েদ (রা.)।

আনসারদের ওপর মুহাজিরদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। বদরের যুদ্ধ ও বাই'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং জিহাদ করেছেন, তাকে মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে।

১। সাহাবীগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ ও ফিতনা সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত:

ফিতনার কারণ:

ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তারা এক নিকৃষ্ট প্রতারককে এ কাজের জন্য নির্ধারণ করে, যে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করতো। সে ছিল আব্দুল্লাহ ইবন সাবা নামক ইয়ামানের এক ইহুদী। অতঃপর এ ইহুদী খোলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলীফা উসমান ইবনে আফফান (রা.) এর বিরুদ্ধে হিংসা ও ঈর্ষার বিষ সম্প্রসারিত করতে শুরু করে এবং তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে থাকে।

ফলে কিছু অদূরদর্শী দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোক- যারা ফিতনা-ফ্যাসাদ পছন্দ করে তার ধোঁকায় পতিত হয়ে তার পাশে জমায়েত হলো, এ ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় উসমান (রা.) নিতান্ত মযলুম হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তার শাহাদাতের পর মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। উক্ত ইহুদী এবং তার অনুসারীদের প্ররোচনায় এ ফিতনা প্রবল আকার ধারণ করল এবং সাহাবীগণ নিজ নিজ ইজতেহাদ মুতাবিক যুদ্ধে লিপ্ত হলেন।

'আত-তাহাবিয়া' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারক বলেন, رفض 'রাফদ' এর ফিতনা সৃষ্টি করে এক মুনাফিক ও যিন্দিক। তার ইচ্ছা ছিল দ্বীন ইসলামকে মিটিয়ে দেয়া এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিন্দা ও কুৎসা রটনা করা যেমন উলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে সাবা যখন ইসলামের ছদ্মবেশ ধারণ করে, তখন সে মূলতঃ স্বীয় ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও নোংরামীর জাল বিস্তার করতঃ ইসলামের বিপর্যয় ও ক্ষতি সাধন করতে চেয়েছিল। খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে ইহুদী ধর্মগুরু যেমনটা করেছিল। তাই সে ইবাদাতগুজার হওয়ার ভান করল। সৎ কাজের নির্দেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার কাজ জাহির করতে লাগল এমনকি উসমান (রা.) সম্পর্কে ফিতনা ছড়িয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টায় সে লিপ্ত হল। এরপর যখন সে কুফায় এলো, তখন আলী (রা.) এর পক্ষে বাড়াবাড়ি করা ও তাকে সাহায্য করার ভান করলো, যাতে সে তার উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। আলী (রা.) কাছে সে তার বিষয়টি পৌঁছালে তিনি তাকে হত্যার হুকুম দিলেন। কিন্তু সে কার্কিস এর দিকে পালিয়ে গেল। ইতিহাসে তার সব ঘটনাই প্রসিদ্ধ।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রাহ.) বলেন,

যখন উসমান (রা.) শাহাদাত বরণ করলেন, তখন মুসলিমদের হৃদয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং সৎ লোকেরা অপদস্ত হল। যারা আগে ফিতনা সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিল, তারা ফিতনা সৃষ্টি করে বেড়াতে লাগল এবং যারা কল্যাণ ও সততা প্রতিষ্ঠা করতে চাইত, তারা তা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়ে গেল। এমতাবস্থায় লোকেরা আমীরুল মুমিনীন আলী ইবন আবু তালিব (রা.) এর কাছে বাইআত গ্রহণ করল। সে সময় তিনিই খেলাফতের সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং জীবিত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন; ক্লিতু যেহেতু মানুষের অন্তকরণ হয়ে পড়েছিল বিভক্ত এবং ফিতনা-ফাসাদের আগুন ছিল প্রজ্বলিত, তাই তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। মুসলিমদের জামা'আত ও সুসংগঠিত হতে পারেনি ফলে খলীফা নিজে এবং উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের কেউই ঈপ্সিত কল্যাণ সাধন করতে সমর্থ হননি। বহুলোক বিচ্ছিন্নবাদিতা ও ফিতনা ফাসাদে লিপ্ত হল। আলী (রা.) এবং মু'আবিয়া (রা.) এর মধ্যকার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ বিবাদ সম্পর্কে ওজর পেশ করতে গিয়ে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, আলী (রা.) সাথে যুদ্ধের সময় মু'আবিয়া (রা.) খেলাফত দাবি করেননি এবং খেলাফতের জন্য কেউ তার কাছে বাই'আতও করেননি। নিজেকে খলীফা মনে করে কিংবা খেলাফতের হকদার ভেবে তিনি আলী (রা.) এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হননি। এ ব্যাপারে যে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি সে কথারই স্বীকৃতি প্রদান করতেন। মু'আবিয়া (রা.) এবং তার সাথীগণ এ মনোভাব পোষণ করেননি যে, তারা আলী (রা.) ও তার সাথীদের সাথে যুদ্ধ শুরু করবেন এবং নিজেদেরকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবেন বরং আলী (রা.) এর সাথীগন ভাবলেন, মু'আবিয়া (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের উচিত আলী (রা.) এর আনুগত্য করা এবং তার কাছে বাই'আত করা। কেননা, মুসলিমদের জন্য একজন খলীফাই শুধু হতে পারে। এদিক থেকে তারা আলী (রা.) এর আনুগত্য থেকে দূরে অবস্থান করছেন এবং এ দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকছে। অথচ তারা শক্তিমত্তারও অধিকারী। তাই আলী (রা.) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জরুরি মনে করলেন। যাতে তারা এ দায়িত্ব পালন করে এবং খলীফার আনুগত্য ও জামা'আতের ঐক্য বহাল থাকে।

পক্ষান্তরে মু'আবিয়া (রা.) ও তাঁর সাথীদের বক্তব্য ছিল: আলী (রা.) এর আনুগত্য ও বাই'আত তাদের ওপর ওয়াজিব নয় এবং এজন্য যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে তারা হবেন মজলুম। এর কারণ বর্ণনায় তারা বলেন, কেননা সকল মুসলমানের ঐক্যমতে উসমান (রা.) মজলুম হয়ে শহীদ হয়েছেন এবং হত্যাকারীগণ আলী (রা.) এর বাহিনীতে অবস্থান করছে। বাহিনীতে তাদেরই প্রাধান্য এবং শক্তি বিদ্যমান। আমরা সংযত থাকলে তারা আমাদের ওপর যুলুম করবে এবং চড়াও হবে অথচ আলী (রা.) এর পক্ষে তাদেরকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। যেমনিভাবে উসমান (রা.) এর ব্যাপারে তাদেরকে বাধা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অতএব, আমাদের এমন খলীফার কাছে বাই'আত হওয়া উচিত, যিনি আমাদের প্রতি ইনসাফ করতে সক্ষম এবং আমাদের প্রতি ইনসাফ করার জন্য তিনি চেষ্টা সাধনা করবেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে যে মতবিরোধ

ও ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতামত নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ ও মতবিরোধের ব্যাপারে তারা চুপ থাকবে এবং এ ব্যাপারে তারা চুলচেরা বিশ্লেষণ থেকেও বিরত থাকবে। কেননা এ ধরণের ক্ষেত্রে চুপ থাকাটাই নিরাপত্তা লাভের পন্থা। আর তাদের জন্য এভাবে দো'আ করবে,

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحَشر : ١٠]

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের আগে আমাদের সে সব ভাইয়েরা ঈমান এনেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।" [সূরা আল হাশর, আয়াত:১০]

২। যেসব রিওয়ায়েতে সাহাবায়ে কেরামের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে, বিভিন্ন পন্থায় নিম্ন লিখিতরূপে সেগুলোর জবাব দেওয়া:

(ক) এসব রিওয়ায়েতের মধ্যে এমন কিছু মিথ্যা বর্ণনাও রয়েছে যা সাহাবায়ে কেরামের বদনাম করার উদ্দেশ্যে তাদের ও ইসলামের শত্রুগণ রচনা করেছে।

(খ) এগুলোতে এমন বর্ণনাও আছে যাতে কিছু পরিবর্ধন করা হয়েছে, কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে এবং এর সঠিক রূপটি পরিবর্তন করে তাতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। ফলে তা বিকৃত বলে পরিগণিত, যার দিকে ফিরে তাকানোও ঠিক নয়।

(গ) এ রিওয়ায়েতগুলোর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম মা'জুর ছিলেন বলে মনে করতে হবে। কেননা তারা সকলেই ইজতিহাদ করেছিলেন এবং এতে হয় তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন কিংবা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আর বিষয়টিও ছিল ইজতিহাদের ক্ষেত্র যাতে ইজতেহাদকারী সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে পাবেন দু'টি সাওয়াব এবং ভুল করলে একটি সাওয়াব ও ভুলটি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কেননা, হাদীসে এসেছে,

"হুকুম দানকারী কোন ব্যক্তি যদি ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তবে তিনি দু'টি সওয়াব পাবেন এবং ইজতিহাদ করে ভুল সিদ্ধান্ত দিলে একটি সওয়াব পাবেন।"

ঘ. তারা ছিলেন আমাদের মতই মানুষ। এককভাবে তারাও ভুল করতে পারেন। তাই একক ব্যক্তি হিসেবে তারা কেউই গোনাহ থেকে মাসুম ছিলেন না; কিন্তু তাদের থেকে যে ভুল-ত্রুটিই প্রকাশিত হয়েছে সে জন্য তাদের বহু কাফফারা তথা নেক আমল রয়েছে, যদ্বারা সে ভুল-ত্রুটি মাফ হয়ে যায়। যেমন-

১। ভুল থেকে তারা তাওবা করেছেন। আর দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, তাওবা সকল গুনাহ-খাতা মিটিয়ে দেয়।

২। তাদের অনেক ফযীলত ও নেক আমল রয়েছে, যদ্বারা তাদের কোনো গুনাহ-খাতা প্রকাশ পেলে তা মাফ হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়।" [সূরা হুদ, আয়াত:১১৪]

৩। অন্যদের নেক আমলের চেয়ে তাদের নেক আমলসমূহ বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। ফযীলত ও মর্যাদায় কেউ তাদের সমপর্যায়ে উপনীত হতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য হতে প্রমাণিত যে, তারাই ছিলেন সর্বোত্তম প্রজন্ম, তাদের এক মুদ বা এক

অঞ্জলী পরিমাণ সদকা অন্যদের ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ সদকা করার চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহ. বলেন, সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও আয়িম্মায়ে কেরাম মনে করেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউই মাসুম নয়; না রাসূলের আত্মীয় সম্পর্কের কেউ, না সাহাবীগণের অগ্রবর্তী দলের কেউ এবং না এতদ্ব্যতীত অন্য কেউ। বরং তাদের মতে সাহাবীগণের থেকে গুনাহ প্রকাশ পেতে পারে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাওবা দ্বারা তাদের গুনাহ মাফ করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। তাদের নেক আমলের বিনিময়ে তাদের গুনাহ মিটিয়ে দেন ইত্যাদি আরো বহু পন্থায় তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾ [الزُّمَر : ٣٣ - ٣٥]

"যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই মুত্তাকী। তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে, যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার, যাতে এরা যে সব মন্দ কাজ করেছিল আল্লাহ তা মার্জনা করে দেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন। [সূরা আয-যুমার, আয়াত : ৩৩-৩৫]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾﴾ [الأَحْقَاف : ١٥ - ١٦]

"অবশেষে যখন সে শক্তি সামর্থের বয়সে পৌঁছে এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয়, তখন বলে, হে আমার রব! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নি'আমতের শোকর করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করতে পারি। আমার জন্য আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর। আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং আমি অবশ্যই তোমার নির্দেশ মান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আমি এমন লোকদেরই সৎকর্মসমূহ কবুল করি এবং মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করে দেই। তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা আল আহকাফ, আয়াত: ১৫-১৬]

ফিতনার সময় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ সংগঠিত হয়েছিল, ইসলামের শত্রুগণ তাকে সাহাবীগণের ওপর অপবাদ আরোপ করার এবং তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার উপায় বানিয়ে নিয়েছে, এমনকি তারা নিজেদের কর্মের মাধ্যমে ইসলামের সুবর্ণ ইতিহাস ও সর্বোত্তম যুগের সালফে সালেহীন সম্পর্কে অনবহিত কিছুসংখ্যক মুসলিম যুবকদের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করেছে, যাতে করে তারা ইসলামের প্রতি আঘাত হানতে পারে ও

মুসলিমদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি আনয়ন করতে পারে এবং এ উম্মতের পূর্ববর্তীদের প্রতি পরবর্তীদের মনে একরাশ ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে, যেন তারা সালফে সালেহীনের অনুকরণ না করে এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করাও ছেড়ে দেয়। অথচ আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠ ﴾ [الحَشْر : ١٠]

“আর যারা তাদের পরে আগমন করেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের আগে আমাদের যেসব ভাইয়েরা ঈমান এনেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।” [সূরা আল হাশর, আয়াত: ১০]





বিশ্ব মানবতার প্রতি মহানবীর ১০ অবদান

সকল প্রশংসা কেবল বিশ্ব জগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী ও রাসূলগণের সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি। অব্যাহতভাবে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোর স্বেচ্ছা বিকৃতির প্রভাবে অমুসলিমদের কেউ কেউ বিশেষত পশ্চিমারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবতার জন্য কী উপস্থাপন করেছেন, মানবতার প্রতি তাঁর অবদান কী তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিশ্ববাসীর সামনে নবীয়ে রহমত বা দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঠিক পরিচয় তুলে ধরার ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ ছাড়াও আমাদের নির্ধারিত কর্তব্যসমূহের একটি হলো বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া। নবীকুল শিরোমনি, নবী ও রাসূলগণের সর্বশেষ আমাদের মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বমানবতার জন্য কী উপহার নিয়ে এসেছেন, তা সংক্ষেপে তুলে ধরা। নিচে দশটি পয়েন্টে ভাগ করে আমরা সে বিষয়টিই আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ :

১। আল্লাহর ওহী লাভের মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বমানবতাকে মানুষের দাসত্ব ও তাদের গোলামি থেকে একমাত্র শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে গেছেন। এতে করে মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। বলাবাহুল্য এটিই মানুষের সবচে বড় সম্মান।

২। আল্লাহর ওহী লাভের মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বমানবতাকে সকল কল্পকথা ও কুসংস্কার এবং সব রকমের মিথ্যা ও প্রতারণার সামনে মাথানত না করার শিক্ষা দিয়েছেন। অক্ষম প্রতিমা ও অলীক প্রভুদের বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করেছেন। মুক্ত করেছেন তিনি সুস্থ বিবেক পরিপন্থী চিন্তাধারার বিশ্বাস থেকে। যেমন- এ কথা বিশ্বাস করা যে, মানুষের

মধ্য থেকেই আল্লাহর কোনো সন্তান রয়েছেন। যিনি কোন অপরাধ বা পাপ ছাড়াই মানবতার কল্যাণে উৎসর্গিত হয়ে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

৩। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব মানবতার চেতনায় ক্ষমা ও উদারতার ভিতগুলোকে সুদৃঢ় করেছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা 'ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই' মর্মে ওহী প্রেরণ করেছেন। এদিকে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুসলিমদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসকারী অমুসলিমদের সকল অধিকার নিশ্চিত করেছেন। তাদের জীবন, সন্তান, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা ঘোষণা করেছেন। তাই তো আজ অবধি মুসলিম দেশগুলোতে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সনম্মানের জীবন যাপন করতে দেখা যায়।

৪। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধর্ম বর্ণ ও বংশ নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার মধ্যে বরং এমন উপাদানেরও অভাব নেই যা পক্ষী ও প্রাণীকুলের প্রতি মায়া-মমতা ও কোমলতা দেখাতেও গুরুত্ব দেয়। নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এদের অকারণে কষ্ট প্রদান কিংবা এদের প্রতি বিরূপ আচরণকে।

৫। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অগ্রবর্তী সকল নবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল চিত্র উপস্থাপন করেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন নবী ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) প্রমুখ নবী-রাসূল। উপরন্তু তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে বাণীই প্রেরণ করেছেন, যে কেউ তাঁদের (আল্লাহর প্রেরিত নবীদের) মধ্যে কাউকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে অথবা তাঁর সম্মানহানী ঘটাবে, সে মুসলিন নয়। কেননা সকল নবী ভাই-ভাই। তাঁরা সবাই মানুষকে শরীক বিহীন এক আল্লাহর প্রতি ডাকার কাজে সমান।

৬। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট-বড় ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার রক্ষা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তার সামাজিক মর্যাদা বা জীবনযাত্রার মানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি।

এ ব্যাপারে তিনি চমৎকার এক নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর অন্যতম হলো বিদায় হজে প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণের কিছু বাণী। এতে তিনি মানুষের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানে আঘাত হানাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি এ ভাষণ প্রদান করেন এমন সময় যখন সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার কথা পৃথিবীবাসী কল্পনাও করেনি।

৭। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জীবনে আখলাক তথা সচ্চরিত্রের মান তুলে ধরেছেন অনেক উঁচুতে। মানুষকে তিনি উত্তম আখলাক তথা সচ্চরিত্র ও তার সহায়ক গুণগুলো বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সততা, সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে তিনি পিতামাতার সঙ্গে সদাচার এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বহাল রাখতে বলেছেন। জীবনে তিনি এর সফল প্রয়োগও ঘটিয়েছেন। পক্ষান্তরে তিনি অসৎ চরিত্র অবলম্বন থেকে বারণ করেছেন। তিনি নিজে যেমন মন্দ স্বভাব থেকে দূরে থেকেছেন, তেমনি অন্যদেরও এ থেকে সতর্ক করেছেন। যেমন: মিথ্যা, ছলনা, হিংসা, যেনা-ব্যভিচার ও পিতামাতার অবাধ্যাচরণ করা। শুধু তাই নয়, এসব থেকে সৃষ্ট সমস্যাবলির

প্রতিকারও বলে দিয়েছেন তিনি।

৮। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুদ্ধি কাজে লাগাতে বলেন। সৃষ্টি জগত উদঘাটন ও তার পরিচয় লাভে উৎসাহিত করেন। একে তিনি নেকী তথা পুণ্য কাজ বলে গণ্য করেন। অথচ একই সময়ে অপর সভ্যতাগুলোর জ্ঞানী ও চিন্তার নায়করা নির্যাতন ভোগ করছিলেন। ধর্ম অবমাননা ও ধর্ম বিদ্বেষকে তখন সর্বাধিক মূল্য দেয়া হচ্ছিল। ধর্মপ্রচারকদের শাস্তি ও কারাভোগ এমনকি মৃত্যুর হুমকি পর্যন্ত দেয়া হচ্ছিল।

৯। আল্লাহর ওহী লাভের মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব বান্ধব এক দীন নিয়ে আবির্ভূত হন যা আত্মিক খোরাক ও দৈহিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখে। পার্থিব কাজ ও আখিরাতের আমলের মধ্যে ভারসাম্য বিধান করে। পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে মানুষের সহজাত বাসনা ও ঝোঁককে। অপরাপর জাতিগুলোর সভ্যতার মতো একে ধ্বংস বা অবদমিত করে না। অন্য জাতিগুলোর সভ্যতায় দেখা যায়, তারা মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধ মূর্তিপূজোর মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। ধর্ম অন্তপ্রাণ ও তপস্যানুরাগীদেরকে তাদের প্রাকৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। যেমন: বিয়ে-শাদি। বঞ্চিত করেছিল অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের স্বভাবসূলভ মানবিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশের অধিকার থেকে। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তাদেরকে একেবারে প্রতিক্রিয়াহীন বানিয়ে ছেড়েছিল। যা ওই সভ্যতার সিংগভাগ সন্তানেরই শিক্ষা ও সুরুচিকে করেছিল লুপ্তপ্রায়। উপরন্তু তাদের ঠেলে দিয়েছিল নিছক জড় জগতের অন্ধকারে। যা কেবল দেহের চাহিদায় সাড়া দেয় আর আত্মাকে নিক্ষেপ করে বিশাল শূন্যতায়।

১০। মানবতার কল্যাণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের আন্তঃসম্প্রদায়ে ভ্রাতৃত্বের পূর্ণাঙ্গ নমুনা পেশ করেছিলেন। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, কোনো মানব সম্প্রদায়ের অন্য মানব সম্প্রদায়ের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মূল সৃষ্টি, অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে তারা সবাই সমান। শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচিত হবে কেবল ঈমান ও তাকওয়া তথা বিশ্বাস ও আল্লাহভীতির নিরিখে। তিনি তাঁর সকল সঙ্গী-সাহাবীকে দীনের খেদমত করার এবং তাতে সম্পৃক্ত হবার সমান সুযোগ দিয়েছেন। তাইতো তাদের মধ্যে আরবদের পাশাপাশি ছিলেন রোম দেশের সুহাইব রূমী, হাবশার বিলাল হাবশী এবং পারস্যের সালমান ফারসী (রা.)।

পরিশেষে: এই দশটি পয়েন্টের প্রতিটিই সংক্ষিপ্ত প্রমাণাদি উল্লেখ পূর্বক বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। কিন্তু আল্লাহর ওহী প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবতার জন্য যা উপহার দিয়েছেন তা উল্লেখের এ জায়গা পর্যাপ্ত নয়। সবিস্তারে এসব পয়েন্ট জানার জন্য নবীয়ে রহমতের সঠিক পরিচয় তুলে ধরার আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামের নিজস্ব ওয়েবসাইট ব্রাউজ করুন।

আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর সকল নবী ভাই এবং তাঁর সকল পরিবার-পরিজন ও সাহাবা- তাবেঈদের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।



সূরা 'আসর' আমাদের যা শেখায়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন নাযিল করেছেন মানুষের জন্য উপদেশ ও জীবন বিধান হিসেবে। এ লক্ষ্যেই তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি:

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾ ﴾ [مُحَمَّد : ٢٤]

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে?" (মুহাম্মদ:২৪)

কুরআন নিয়ে যতই চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা হবে অন্তরে কুরআনের আবেদন ও কুরআনের প্রতি ভক্তি ততই বৃদ্ধি পাবে। মানুষের স্বভাব চরিত্রে, আচার-আচরণে এর প্রভাব পড়বে। তাইতো আমরা দেখি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) আনহাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন, 'তাঁর চরিত্র ছিল আল কুরআন'। (মুসলিম)

কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনকে নিজের জীবনের পাথেয় হিসেবে নিয়েছিলেন। এতে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করেছেন এবং নিজ জীবনে তা পূর্ণাঙ্গ রূপে বাস্তবায়ন করেছেন।

আমরা আজ কুরআন পাঠ করি। কিন্তু তা আমাদের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলে না। আমাদের জীবনাচারে পরিবর্তন সূচিত করে না। কারণ আমরা কুরআনের মর্ম নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা করি না। আলী (রা.) বলেছেন, 'যে কুরআন পাঠে চিন্তা-ভাবনা নেই, সে পাঠে কোন কল্যাণ নেই।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, আজ তোমরা সূরা ফাতেহা থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এমনভাবে কুরআন খতম করো যে, একটি হরফও বাদ পড়ে না। কিন্তু বাস্তব কথা হল, সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন বাদ পড়ে যায়।'

আমরা সূরা আসর পাঠ করি। তা মুখস্থও করেছি। জীবনে কতবার যে পাঠ করেছি তার হিসেব তো নিজের কাছেও নেই; কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছি যে, ছোট এই সূরাটির মধ্যে

আল্লাহ তা'আলা কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রেখেছেন। কত চমৎকার হেদায়েত রেখেছেন এ সূরাটির মধ্যে। ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির স্পষ্ট সনদ রেখেছেন মাত্র তিন আয়াত বিশিষ্ট এ সূরার মধ্যে। সাহাবায়ে কেরামের অনেকের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা যখন একজন অপর জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করতেন তখন সূরা আল আসর পাঠ করে শুনাতেন। (তাবরানি, হায়সামি ফি মাজমাআয যাওয়ায়েদ)।

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, আল্লাহ তাআলা যদি কুরআনে অন্য কোন সূরা নাযিল না করে শুধু সূরা আল আসর নাযিল করতেন তাহলে এটা মানুষের হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট হত। (মিফতাহুস সাআদাত, ইমাম শাফেয়ী)

যদি কেউ এ সূরায় গভীরভাবে দৃষ্টি দেয় তাহলে সে তাতে একটি উন্নত, সুন্দর, শান্তিময়, পরিপূর্ণ এবং সবার জন্য কল্যাণকর সমাজের চিত্র দেখতে পাবে। (আদওয়াউল বায়ান, ৯/৫০৭)

মহান আল্লাহ এ সূরাটি শুরু করেছেন 'ওয়াল আসর' শব্দ দিয়ে, যার দুটো অর্থ রয়েছে।

এক. যুগ বা সময়।

দুই. আসরের নামাজের সময়, যার আগমন হয় জোহরের নামাজের সময় শেষ হওয়ার পর এবং শেষ হয় সূর্যাস্তের মধ্য দিয়ে। আল্লাহ তা'আলা কোনটির শপথ করেছেন? সময়ের শপথ না আসরের ওয়াক্তের শপথ? সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হল তিনি 'আসর' বলতে এখানে সমস্ত সময়ের শপথ করেছেন। করেছেন যুগের শপথ। আর যুগের গর্ভেই এক জাতির উত্থান ঘটে, অন্য জাতির ঘটে পতন। রাত্রি আসে, যায় দিন। পবির্তিত হয় পরিবেশ ও মানব সমাজ। এমন সব পরিবর্তন আসে যা মানুষ কল্পনা করতে পারেনা। কখনো অনাকাঙ্খিত কখনো বা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি পরিবর্তন আসে এ সময়ের ব্যবধানেই। তাই এ যুগ বা সময় বড় বিস্ময়কর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাবন, দানব, জীব-জন্তুসহ সকল সৃষ্টিকুলের জন্য। এটা বুঝানোর জন্যই আল্লাহ তা'আলা সময়ের শপথ করেছেন। (আত তিবইয়ান ফি আকসামিল বায়ান, ইবনুল কায়্যিম আল জাওযি) কোনো বস্তু বা বিষয়ের শপথ করলে তার অস্বাভাবিক গুরুত্ব বুঝায়। সময় এমনই এক বিস্ময়ের আধার যে, আমরা জানি না অতীত কালে এটা কি কারণে হয়েছে। আমরা জানি না ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে। এমনকি আমাদের নিজেদের জীবন, নিজের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সম্পর্কে আমরা বলতে পারি না যে, আগামী কালকের পরিবেশটা ঠিক আজকের মত থাকবে কি থাকবে না। দেখা যায় মানুষ নিজ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা নিয়েছে। আগামীকাল এটা সে বাস্তবায়ন করবে। অর্জন করবে। এটা সেটা অনেক কিছু। সে দৃঢ় প্রত্যয়ী থাকে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে। সব উপকরণ থাকে হাতের নাগালে। সব মাধ্যম ও ফলাফল থাকে আপন নখদর্পনে। কোনো কিছুরই অভাব নেই।

তবুও এ 'সময়' নামক বস্তুটির ব্যবধানে এমন কিছু ঘটে যায় যা তার সব কিছুকে ধ্বংস করে দেয়। সে ভাবতেই পারে না- কেন এমন হল। অনেক বড় বড় হিসাব সে মিলিয়েছে কিন্তু এর হিসাব সে মেলাতে পারছে না। এটাই হল 'সময়'। আল্লাহ তা'আলা এর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই বলেছেন, 'ওয়াল আসর'- শপথ সময়ের। এ থেকে আমরা জীবনের জন্য সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ হলেন মহান। তিনি মহান বস্তু ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর শপথ করেন না।

তাফসিরবিদ ইকরামাসহ অনেকে বলেছেন,

'আসর' বলতে এখানে আসরের নামাজের সময়ের শপথ করা হয়েছে। কেননা আসর নামাজের সময়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রখ্যাত তাফসিরবিদ ইবনে জারির আত তাবারী রহ. বলেছেন, "সঠিক কথা হল এখানে 'আসর' বলতে আল্লাহ তাআলা 'সময়'কে বুঝিয়েছেন। যুগের অপর নাম সময়। সকাল, বিকাল, দুপুর, রাত, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর, যুগ, শতাব্দী, সহস্রাব্দ ইতাদি সব কিছুই বুঝায় এ 'আসর' বা 'সময়' নামক শব্দ। (জামেউল বায়ান : ১৫/২৮৯)

যদি এ সূরাটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে, সময়টাকে সকল যুগে টেনে নেয়া হয়েছে। মানুষকে সময়ের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছে। সময় ছাড়া মানুষের জীবন যেমন সচল নয়, তেমনি সময় ব্যতীত তাদের কোনো অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতও নেই।

দ্বিতীয় আয়াত:

﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢﴾ [العَصر : ٢]

'অবশ্যই মানুষ ক্ষতিতে নিপতিত।' [সূরা আসর: ২]

যদিও এখানে ইনসান বা মানুষ শব্দটি এক বচনে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তার পূর্বে জাতি বাচক আলিফ লাম ব্যবহার করে পুরো মানব জাতিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পুরো মানবগোষ্ঠি ক্ষতিগ্রস্ত। তারা সকলে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তবে যাদের মধ্যে চারটি গুণ আছে তারা ব্যতীত। এ চারটি গুণের অধিকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। তারা লাভবান সর্বদা। লাভবান ইহকাল ও পরকালে। পরবর্তী আয়াতে এ চারটি গুণের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় আয়াত :

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ۝٣﴾ [العَصر : ٣]

"তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে"। [সূরা আসর: ৩]

চারটি গুণ যাদের মধ্যে থাকবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে নাঃ

এক. ঈমান আনয়ন করা।

দুই. সৎকাজ বা আমালে সালেহ করা।

তিন. অন্যকে সত্যের পথে আহবান করা।

চার. অন্যকে ধৈর্যের উপদেশ দান করা।

একজন মুসলিম শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে না। নিজের সুখে সন্তুষ্ট থাকে না। অন্যের কথা চিন্তা করতে হয় তাকে। অন্যের কল্যাণে কাজ করতে হয়। অন্যের দুঃখে দুঃখী ও অন্যের সুখে সুখী হওয়া তার কর্তব্য। এজন্য এ চারটি গুণের প্রথম দুটো গুণ নিজের কল্যাণের জন্য আর পরের গুণ দুটো হল অন্যের কল্যাণের জন্য। প্রথম গুণ দুটো দ্বারা একজন মুসলিম নিজেকে পরিপূর্ণ করে, আর অপর দুইগুণ দ্বারা অন্যকে পরিপূর্ণ করার প্রয়াস পায়।

প্রথম গুণটি হল ঈমান। এটা একটা ব্যাপক ভিত্তিক আদর্শের নাম। প্রখ্যাত তাফসিরবিদ মুজাহিদ রহ. বলেছেন, ঈমান হল, আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা, তাঁর একত্ববাদকে সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করা। তাঁর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে সবগুলোকে মেনে নেয়া এবং সর্বক্ষেত্রেই তার কাছে জওয়াব দিতে হবে- এ আদর্শ ধারণ করা। (তাফসিরে তাবারি)

ঈমানের পর নেক আমল বা সৎকর্মের স্থান। সৎকর্ম কম বেশি সকল মানুষই করে। তবে ঈমান নামক আদর্শ তারা সকলে বহন করে না। ফলে তাদের আমল বা কর্মগুলো দিয়ে লাভবান হওয়ার পরিবর্তে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। সৎকর্মশীল

মানুষগুলো যদি ঈমান নামের আদর্শকে গ্রহণ করে তাহলে এ সৎকর্ম দ্বারা তারা দুনিয়াতে যেমন লাভবান হবে আখেরাতেও তারা অনন্তকাল ধরে এ লাভ ভোগ করবে। আর যদি সৎকর্মের সঙ্গে ঈমান নামের আদর্শ না থাকে, তাহলে সৎকর্ম দিয়ে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কিছুটা লাভবান হলেও আখেরাতের স্থায়ী জীবনে এটা তাদের কোনো কল্যাণে আসবে না। এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রথমে ঈমানের কথা বলেছেন।

সৎকর্ম হল, যা কিছু ইসলাম করতে বলেছে সেগুলো পালন করা আর যা কিছু নিষেধ করেছে সেগুলো থেকে বিরত থাকা। হতে পারে তা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব বা নফল। আর বর্জনীয় বিষয়গুলো বর্জন করে চলা। হতে পারে তা হারাম, মাকরূহ।

যখন মানুষ ঈমান স্থাপন করল, তারপর সৎকর্ম করল, তখন সে নিজেকে পরিপূর্ণ করে নিল। নিজেকে লাভ, সফলতা ও কল্যাণের দিকে পরিচালিত করল। কিন্তু ঈমানদার হিসাবে তার দায়িত্ব কি শেষ হয়ে গেল? সে কি অন্য মানুষ সম্পর্কে বে-খবর থাকবে? কিভাবে সে এত স্বার্থপর হবে? অন্য সকলকে কি সে তার যাপিত কল্যাণকর, সফল জীবনের প্রতি আহ্বান করবেনা? কেনই বা করবে না? সে তো মুসলিম। তাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে তো বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্য। আর এ জন্যই তো মুসলিমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। আল্লাহ তা'আলা তো বলেই দিয়েছেন-

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾ [آل عِمْرَان : ١١٠]

"তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে"। [সূরা আলে ইমরান-১১০]

অতএব নিজেকে ঠিক করার পর তার দায়িত্ব হবে অন্যকে কল্যাণের পথে আহ্বান করা। তাই ঈমান ও সৎকর্ম নামক গুণদুটো উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা আরো দুটো গুণের কথা বললেন:

﴿وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾﴾

"আর তারা পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে"।

সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করা, এ আহ্বান করতে গিয়ে ও আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে যে সকল বিপদ-মুসিবত, অত্যাচার-নির্যাতন আসবে তাতে ধৈর্য ধারণের জন্য একে অন্যকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য। প্রশ্ন হতে পারে সত্যের মধ্যেই তো ধৈর্য আছে। ধৈর্য তো হক বা সত্যের একটি। তাহলে এটা আলাদাভাবে উল্লেখ না করলে কি হত না? কোনো বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাতে সাধারণভাবে তা উল্লেখ করা হলেও আবার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। পরিভাষায় এটাকে বলা হয়, ذكر الخاص بعد العام কোনো বিষয় অর্জন করা সহজ হতে পারে, কিন্তু সেটি ধরে রাখা ও তার ওপর অটল থাকা ততটা সহজ নাও হতে পারে। আর এজন্যই প্রয়োজন ধৈর্য ও সবরের।

সূরা থেকে অর্জিত শিক্ষা ও মাসায়েলসমূহ:

১। এ সূরার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, চারটি বিষয় অর্জন করা আমাদের জন্য জরুরি:

এক. ইলম বা জ্ঞানার্জন। ইলম ব্যতীত ঈমান স্থাপন সম্ভব নয়। ঈমানের জন্য কমপক্ষে তিনটি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে। (ক) আল্লাহ তা'আলাকে জানতে হবে। (খ) তাঁর রাসূলকে জানতে হবে।

(গ) তাঁর প্রেরিত দীন-ধর্মকে জানতে হবে।

এগুলো জানার পরই তার ওপর ঈমান আনা সম্ভব। ইরশাদ হয়েছে-

﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ ١٩﴾ [مُحَمَّد : ١٩]

অতএব, জেনে নাও যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। [সূরা মুহাম্মাদ : ১৯]

আমরা দেখলাম, এ আয়াতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর প্রতি ঈমান আনার পূর্বে জানতে বলেছেন। অর্থাৎ ইলম অর্জন করতে বলেছেন। তারপর ইস্তিগফার তথা আমল করতে বলেছেন।

দুই: ইলম অনুযায়ী কাজ করা। তিনটি বিষয়- আল্লহ, রাসূল ও দ্বীন সম্পর্কে ইলম অর্জন করে আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করার পর সেই ইলম বা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে হবে।

তিন. অন্যকে এই ইলম ও আমলের দিকে আহ্বান করতে হবে বা দ্বীনে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে হবে।

চার. ইলম, ঈমান ও দাওয়াত দিতে গিয়ে যে সকল বিপদ-মুসীবত, দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, তাতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে ও অন্যকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতে হবে। এছাড়া সকল প্রকার বিপদ মুসিবতে, দুর্যোগ-দুর্বিপাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং অন্যকে ধৈর্য ধারণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

২- আল্লাহ তা'আলা 'আল আসর' তথা সময়, হায়াত, যুগের শপথ করেছেন। এ শপথের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে সময় ও জীবনের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। মানুষের আয়ু কত মূল্যবান তা অনুধাবন করতে বলেছেন। তেমনি 'আসর' এর কসম করে যা বলেছেন সেটারও গুরুত্ব বুঝিয়েছেন তিনি। আর তাহল; মানুষ ক্ষতিতে নিপতিত। মানুষ ধ্বংসের দিকে ধাবিত। তাই ক্ষতির পথ ছেড়ে তাকে লাভ ও কল্যাণের পথে আসতে হবে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারা কিন্তু সময়টাকে বর্ণিত কাজগুলোতে লাগাচ্ছে না বলেই তারা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে।

৩- আল্লাহ তা'আলা যুগের শপথ করেছেন। যুগে যুগে যা কিছু ঘটেছে সেগুলো ইতিহাস। তাতে রয়েছে মানুষের জন্য শিক্ষা ও নসিহত। যুগে যুগে অত্যাচারী শক্তিধর জাতির পতন ঘটেছে। নির্যাতিত দুর্বল জাতির উত্থান হয়েছে। এসবই মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সর্বময় ক্ষমতার প্রমাণ।

৪- মানুষ দুনিয়াতে তার পার্থিব জীবন অতিবাহিত করে বার্ধক্যে উপনীত হয় বটে কিন্তু সে লাভবান হয় না। তবে যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করেছে, ধৈর্য ধারণ করেছে তারা এর ব্যতিক্রম। তারা বৃদ্ধ অক্ষম হয়ে গেলেও তাদের নামে সৎকর্ম যোগ হতে থাকে। যেমন আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একাধিক বার বলতে শুনেছি: 'কোন মানুষ যখন সৎকর্ম করতে থাকে, পরে তাকে রোগ-ব্যাধি পেয়ে বসে অথবা সফর অবস্থায় থাকে, তখন তার কর্ম বিবরণীতে সে আমলগুলো লেখা হতে থাকে, যেগুলো সে সুস্থ ও গৃহে থাকাবস্থায় করে আসছিল'। (বুখারী, জিহাদ অধ্যায়)

৫। মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকভাবে হতে পারে :

প্রথম : কুফরি করার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। যেমন-আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥﴾ [الزُّمَر : ٦٥]

"আর অবশ্যই তোমার কাছে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি শিরক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই। আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। (সূরা যুমার: ৬৫)

দ্বিতীয় : মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম কম হয়ে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ١٠٣﴾ [المُؤۡمِنُون : ١٠٣]

"আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করল"। (মুমিনূন:১০৩)

তৃতীয়- সত্য তথা ইসলাম গ্রহণ না করে অন্য আদর্শ গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। যেমন- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ [آل عِمۡرَان : ٨٥]

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। (আলে ইমরান : ৮৫)

চতুর্থ: ধৈর্য ধারণ না করে হতাশ হয়ে পড়ার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ ١١﴾ [الحج : ١١]

"মানুষের মধ্যে কতক এমন রয়েছে, যারা দ্বিধার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত করে যদি তার কোনো কল্যাণ হয় তবে সে তাতে প্রশান্ত হয়। আর যদি তার কোনো বিপর্যয় ঘটে, তাহলে সে তার আসল চেহারায় ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি হল সুস্পষ্ট ক্ষতি।" (হজ : ১১)

৬- ঈমানের আভিধানিক অর্থ, সত্যায়ন করা, স্বীকার করা, মেনে নেয়া।

পারিভাষিক অর্থ, হাদিসে জিবরীলে বর্ণিত ঈমানের যে ছয়টি ভিত্তি আছে তার সবগুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। এটকু বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে বলা যায়, ঈমান হল: অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, মুখ দিয়ে স্বীকার করা আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে তা বাস্তবায়ন করা। তাই শুধু বিশ্বাস দিয়ে কাজ হবে না, যদি না সে বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করা হয়।

৭- আমর বিল মারুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ অন্যকে সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করার গুরুত্ব অনুধাবন করা যেতে পারে। সত্যের পথে মানুষকে আসার উপদেশ দেয়া মানে সৎকাজের আদেশ করা। এর জন্য প্রয়োজন হবে ধৈর্যের। যেমন- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন লুকমান হাকিমের উপদেশ উল্লেখ করেছেন। সেখানেও বিষয়টি দেখা যায়। লুকমান তার ছেলেকে বলেছিলেন:

﴿يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧﴾ [لُقۡمَان : ١٧]

"হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজে নিষেধ

কর এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ"। (লুকমান:১৭)

৮- আমালে সালেহা বা সৎকর্মের মধ্যে হুকুকুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার) ও হুকুকুল ইবাদ (মানুষের অধিকার) দুটোই অন্তর্ভুক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির গুরুত্ব দিলে কাজ হবেনা। তাওহিদে বিশ্বাস, ঈমানে কামেল, ইবাদত-বন্দেগী, ফরজ-ওয়াজিব ও সুন্নাত-মুস্তাহাব আমলগুলো যেমন সৎকর্ম তেমনি পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সহকর্মী-সহযাত্রীদের সঙ্গে সদাচারণ, তাদের অধিকার সংরক্ষণ করাও সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। দেখুন কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের অধিকার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অধিকার সংরক্ষণের কথাও বলেছেন। যেমন-

﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦﴾ [النِّسَاء : ٣٦]

"তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সঙ্গে, নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে, ইয়াতিম, মিসকিন, নিকট আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানা ভুক্ত দাস-দাসীদের সঙ্গে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।" (সূরা নিসা:৩৬)

৯- সবর বা ধৈর্য তিন প্রকার: (ক) আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ করা। তাঁর আদেশ নির্দেশগুলো মানতে গিয়ে অধৈর্য না হওয়া। এটাকে বলা হয়- الصبر على طاعة الله

(খ) আল্লাহর অবাধ্য না হওয়ার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু হারাম করেছেন সেগুলোর ধারে কাছে না গিয়ে ধৈর্য অবলম্বন করা। এটাকে বলা হয়: الصبر عن معصية الله

(গ) উপস্থিত বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করা। এটাকে বলা হয়: الصبر على أقدار الله

১০- সূরা আল বালাদেও অন্যকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়ার নির্দেশ এসেছে, সেখানে এর সঙ্গে আরও একটি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। যেমন-

﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡمَرۡحَمَةِ ١٧ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ ١٨﴾ [البَلَد : ١٧ - ١٨]

"অতঃপর সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের, আর পরস্পরকে উপদেশ দেয় দয়া-অনুগ্রহের। তারাই সৌভাগ্যবান।" (সূরা বালাদ:১৭-১৮)

এ আয়াতে মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, তারা ধৈর্য ধারণ আর পরস্পরকে দয়া-অনুগ্রহ করার উপদেশ দেয়। তারা ডানপন্থী দল। তাই একজন মুমিন যেমন নিজে ধৈর্য ধারণ করে ও অন্যকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়, তেমনি সে নিজে দয়া অনুগ্রহ করে ও অন্যকে দয়া অনুগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহ আমাদেরকে সূরা আল আসরের শিক্ষাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তাওফিক দান করুন। আমীন!



উত্তম চরিত্র অবলম্বনের
উপায় ও উপকারিতা

মানব জীবনের এক অনন্য ভূষণ হল আখলাকে হাসানা বা উত্তম চরিত্র। যা ব্যতীত কেউ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারে না। তাই দেখা যায়, প্রতিটি মহা-মানবের মধ্যেই এ গুণ ছিল অবধারিতভাবে। আবু সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত, হিরাকল বাদশা তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, 'নবী তোমাদেরকে কি করার আদেশ দেয়? প্রতিউত্তরে সে জানায়, 'তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না। তোমাদের পূর্ব পুরুষ যা বলতেন তোমরা তা ছেড়ে দাও। আর আমাদেরকে তিনি সালাত, সততা, পূত চরিত্র ও আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার আদেশ করেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে উত্তম চরিত্র অবলম্বনের আদেশ করতেন। তিনি প্রভুর নিকট দুআ করতেন, "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট হিদায়াত, তাকওয়া, সচ্চরিত্র ও অভাবমুক্তির প্রার্থনা করছি।" (মুসলিম:৪৮৯৮)

উত্তম চরিত্রের উপাদানসমূহঃ

(১) হারাম থেকে বিরত থাকা ঃ হারাম উপার্জন ও হারাম ভক্ষণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা। এর দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে যে দেহ হারাম দ্বারা লালিত তার ঠিকানা জাহান্নাম। তাছাড়া হারাম খাদ্য থেকে বেঁচে থাকলে দুআ কবুল হয় এবং আল্লাহ্ বিশেষভাবে তাকে হেফাজত করেন।

(২) ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকা ঃ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿لَا يَسۡـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلۡحَافٗاۗ ٢٧٣﴾ [البَقَرَة : ٢٧٣]

'তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না।' (বাকারা : ২৭৩)

আউফ ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবিকে বললেন, 'তোমরা কেন বাইয়াত গ্রহণ কর না? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল,

আমরা তো বাইয়াত গ্রহণ করেছি। নতুন করে কোন বিষয়ে আপনার হাতে বাইয়াত করব? তিনি বললেন, তোমরা মানুষের কাছে কিছু প্রার্থনা করো না।

তাই কর্তব্য হলো ঃ

- আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছে আশ্রয় না চাওয়া।
- তাঁর ওপর সত্যিকারার্থে ভরসা করা।
- নিজের সম্মান রক্ষা করা।
- মাখলুকের নিকট ভিক্ষা করার লাঞ্ছনা থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

এক্ষেত্রে মানুষ কয়েক ভাগে বিভক্ত। সকলে এক পর্যায়ের নয়। কারো ক্ষেত্রে ভিক্ষা না করা ওয়াজিব। যেমন প্রয়োজন না হলে সম্পদ না চাওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি সম্পদ বাড়ানোর জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা চায় সে যেন আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার চেয়ে বসল। অতএব, তা কম করুক বা বেশি করুক সেটা তার ইচ্ছা।'

কারও ক্ষেত্রে ভিক্ষা ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব নয়। তাদের ক্ষেত্রে ভিক্ষা ছেড়ে দেয়া মর্যাদার বিষয়। যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখিত আউফ ইবনে মালেকের রেওয়ায়েতে আছে, 'আমি তাদের কতেককে দেখেছি ঘোড়ায় আরোহিত অবস্থায় হাতের লাঠি পড়ে গেলে, তা উঠিয়ে দেয়ার জন্যে অন্য কারও সাহায্য চাইতেন না।' (মুসলিম:১৭২৯)

(৩) লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা ঃ

অশ্লীল কাজ ও অশ্লীলতার যাবতীয় উপকরণ থেকে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ﴿٣٣﴾ ﴾

[النُّور : ٣٣]

'যারা বিবাহ করতে পারে না, তারা যেন নিজেদেরকে হিফাজত করে।' [নূর : ৩৩]

তিনি আরও ইরশাদ করেন,

﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾ [النُّور : ٣٠]

"(হে নবী!) আপনি মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নিচু করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হিফাজত করে। এটাই তাদের জন্য পবিত্র পন্থা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা তাদের কর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত"। [সূরা নূর : ৩০]

লজ্জাস্থান পবিত্র রাখবেন কেন?

লজ্জাস্থানের হিফাজতকারীকে আল্লাহ তাআলা আরশের নিচে ছায়া দিবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সাত প্রকার ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা আরশের নিচে ছায়া দিবেন। তাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত যাকে কোনো সুন্দরী সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারী কু-কুর্মের দিকে আহ্বান করলে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি'। (বুখারি : ১৩৩৪)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মধ্যকার মুখ ও দুই পায়ের মধ্যকার লজ্জাস্থান হিফাজতের জিম্মাদার হলো, আমি তার জান্নাতে প্রবেশের দায়িত্ব নিলাম'।

লজ্জাস্থান হিফাজতের উপায় ঃ

- সর্বাত্মকভাবে নিজের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করা।
- যৌবনের পদার্পনের পর অনতিবিলম্বে বিবাহ করা।
- বিবাহে অপারগ হলে সিয়াম পালন করা।

- নারীর শতভাগ পর্দা রক্ষা করা।
- অপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের না হওয়া। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

﴿ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ ﴿٣٣﴾ ﴾ [الأحزاب : ٣٣]

“আর তোমরা (নারীরা) ঘরে অবস্থান করো, এবং জাহেলী যুগের নারীদের মত খোলামেলা চলাফেরা করো না”। (আহযাব : ৩৩)

- অপরিচিত নারীর সঙ্গে নির্জনে অবস্থান না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তোমরা নারীদের নিকট প্রবেশ করার ব্যাপারে সতর্ক থাক”।
- কোন নারীর সঙ্গে মুসাফাহা না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘আমি নারীর সঙ্গে মুসাফাহা করি না’।
- নারী-পুরুষ একসঙ্গে মেলামেশা না করা।
- অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে এমন সব কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ ﴿٣٢﴾ ﴾ [الإسراء : ٣٢]

“আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না”। [বনি ইসরাঈল: ৩২]

অশ্লীল কথা শোনা, অশালীন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা, অশ্লীল ছবি বা সিনেমা দেখা, অশ্লীল কিছু পাঠ করা এ সবই আয়াতের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

পবিত্রতা ম্লান হওয়ার কারণসমূহ:

(১) অভিভাবক ও মুরব্বিগণের তারবিয়্যত ও নজরদারি দুর্বল হওয়া।

(২) হারাম বস্তুর প্রতি অবাধে দৃষ্টিপাত। এটি ফিতনার সবচেয়ে বড় কারণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘চোখের ব্যভিচার হলো দৃষ্টিপাত’। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আকস্মিক দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে বললেন। বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

‘হে আলী, তুমি প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিও না। প্রথমটি তোমার জন্য জায়েয বটে, কিন্তু দ্বিতীয়টির অধিকার নেই’।

(৩) যুবক-যুবতীদের দেরি করে বিবাহ দেয়া।

(৪) এমন দেশে ভ্রমণ করা, যেখানে বেহায়া ও উলঙ্গপনা সর্বব্যাপী।

(৫) অপরিচিত নারীর সঙ্গে মেলামেশা ও নির্জনবাসের ব্যাপারে অবহেলা করা। পূর্বসূরীগণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক করতেন। উবাদা বিন সামেত (রা.) একজন বয়োজেষ্ঠ আনসারি সাহাবি। তিনি বলেন, ‘তোমরা দেখ না আমি অন্যের সাহায্য ব্যতীত দাঁড়াতে পারি না এবং নরম খাবার ব্যতীত খেতে পারি না। আমার সঙ্গী অনেকদিন হল মারা গেছে। তথাপি সারা পৃথিবীর বিনিময়েও কোনো অপরিচিত নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকা আমার পছন্দ হয় না। কেননা শয়তান হয়তোবা আমার প্রবৃত্তিকে নাড়া দিতে পারে।

(৬) যে ব্যক্তি নিজে পবিত্র থাকতে চায় না এবং সমাজকে কলুষমুক্ত রাখতে চায় না এমন লোকের সঙ্গে উঠাবসা করা। অতএব এ ধরণের লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করে ভালো লোকদের সঙ্গ তালাশ করা উচিত।

(৭) দ্বীন-দুনিয়ার উপকার হয়, এমন কাজে



নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রাখা উচিত। যাতে শয়তানি চিন্তা-ভাবনা আক্রমণ করতে না পারে।

মোটকথা, শরী'য়তের হুকুম আহকাম ছেড়ে দেয়াই চরিত্রে দুর্বলতার সবচেয়ে বড় কারণ।

লজ্জাস্থান হিফাজতের সুফলঃ

(১) চরিত্রবান ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশের দায়িত্ব নিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

(২) কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলার ছায়ায় আশ্রয় লাভ।

(৩) ব্যক্তির পবিত্রতা তার পরিবার ও মাহরাম আত্মীয়দের পবিত্রতার কারণ। যে ব্যক্তি হারামে লিপ্ত হয়, তার নিজের ও পরিবারের ওপর যে কোনো সময় এর খারাপ পরিণতি নেমে আসতে পারে।

(৪) ধ্বংসাত্মক রোগ, ফ্যাসাদ, বিপদাপদ ও অনিষ্ট এবং এইডস ইত্যাদি মরণব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

(৫) সাধারণ ও বিশেষ শাস্তি এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সব রকমের চারিত্রিক আবিলতা ও কলুষতা থেকে দূরে থাকার তাওফিক দিন। সকলকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি ও কামিয়াবি অর্জনের মাধ্যমে ধন্য করুন। আমিন।



আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়

পৃথিবীতে যা কিছু দেখি সব কিছুই আল্লাহর নিয়ামত। আমাদের শরীরের মধ্যে হাত,পা, চোখ, কান, সবই আল্লাহর নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তা বলে এবং লিখে শেষ করা যাবে না। আমরা যা কিছু দেখি সবই আল্লাহর নিয়ামত। আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٨﴾ [النَّحل : ١٨]

“আর যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু”। [সূরা আন নাহল-১৮]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلۡتُمُوهُۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَظَلُومٞ كَفَّارٞ ٣٤﴾

[إِبۡرَاهِيم : ٣٤]

“আর তোমরা যা চেয়েছ আল্লাহ তোমাদেরকে তাই প্রদান করেছেন। যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ”। [সূরা ইবরাহীম-৩৪]

প্রতিটি মানুষের আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা দরকার ভাল এবং মন্দ দুটির জন্যই। তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিয়ামতকে আমাদের জন্য আরো বৃদ্ধি করে দিবেন, আর যদি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করি তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিয়ামত ছিনিয়ে নিবেন এবং কঠোর শাস্তি দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذۡ تَأَذَّنَ رَبُّكُمۡ لَئِن شَكَرۡتُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡۖ وَلَئِن كَفَرۡتُمۡ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٞ ٧﴾ [إِبۡرَاهِيم : ٧]

“যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর”। [সূরা ইবরাহীম : ৭]

পৃথিবীতে যা কিছু আছে বা যা কিছু নতুন করে আসবে সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর সৃষ্টিকুলের জন্য নিয়ামত। যদিও তা মানুষের হাতের তৈরি হোক না কেন। মানুষ যা কিছু তৈরি

করে তা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে থেকে তৈরি করে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النَّحل : ٥٣]

"তোমাদের কাছে যে সমস্ত নিয়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে"। [সূরা নাহল : ৫৩]

এই সময়ে আমাদের কাছে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর নিয়ামত। যেমন, মোবাইল, কম্পিউটার, বিমান, মিডিয়া ইত্যাদি সব কিছুই আল্লাহর নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। আর নিয়ামতকে সঠিকভাবে সঠিক কাজে লাগিয়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করা চাই। কারণ কিয়ামতের দিন নিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التَّكَاثُر : ٨]

"এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে"। [সূরা তাকাসূর:৮]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (দুনিয়ার ব্যাপারে) তোমরা তোমাদের চেয়ে নিচের ব্যক্তির দিকে তাকাবে। তোমাদের চেয়ে উপরের স্তরের ব্যক্তির দিকে তাকাবে না। এতে তোমাদের উপর আল্লাহর যে নিয়ামতসমূহ আছে তা তুচ্ছ মনে হবে না। (ইবনে মাজাহ, ৪১৪২, মুসলিম, সুনান তিরমিযি (ইফা.) ২৫১৫)

আমাদের জন্য আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল 'ইসলাম'। আল্লাহ আমাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে মনোনীত করেছেন এবং মুসলিমের ঘরে জন্ম দিয়েছেন।

তারিক ইবনে শিহাব (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদী উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীনঃ

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾ [المَائِدَة : ٣]

"আজ পরিপূর্ণ করে দিলাম আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, পরিসমাপ্তি করে দিলাম তোমাদের উপর আমার নিয়ামত আর দ্বীন হিসাবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম"। (৫:৩)

আয়াতটি যদি আমাদের উপর নাযিল হত তাহলে সেই দিনটিকে আমরা উৎসবের দিন হিসাবে নির্ধারণ করতাম। উমর (রা.) বললেন, আমি অবশ্যই জানি এই আয়াতটি কোন দিন নাযিল হয়েছিল, এটি আরাফার দিন, জুমাবারে নাযিল হয়েছিল। (বুখারি : ৪৬০৬, মুসলিম)

আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের মধ্যে আরো একটি বড় নিয়ামত হল আল কুরআন যা পৃথিবীকে অন্ধকার থেকে আলোতে পরিবর্তন করেছে। আলোকিত করেছে আমাদের জীবনকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا ۜ ﴾ [الكَهْف : ١]

"সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেন নি"। [সূরা কাহফ-১]

আল্লাহর নিয়ামতের কথা লিখে কখনই শেষ করা যাবে না।

পরিশেষে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতঃ সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন!



তাওবাহ

তাওবাহ মুমিন জীবনের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আমরা প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু ভুল করি। আর এই ভুলগুলো মোচনের জন্য মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাওবার বিধান রেখেছেন। অতএব, এ তাওবাহ্ বিশ্ব মানবতার কলঙ্ক, গুনাহ্ ও পাপ হতে মুক্ত করতে খুবই গুরুত্ব বহন করে। আর আমরা যদি তাওবা করতে চাই তবে তাওবাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা অত্যাবশ্যক। নিচে তাওবা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলঃ

তাওবাহ্ শব্দের শাব্দিক অর্থ হল ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা।

পরিভাষায় তাওবাহ হল ঃ

পূর্বের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাৎক্ষণিক তা ত্যাগ করতঃ ভবিষ্যত জীবনে ঐ পাপ কাজ করবে না মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। আর পূর্বকৃত পাপ যদি মানুষের হক্বের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। সামর্থ্যানুযায়ী সর্বদা তাওবাহ্ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। ছোট বা বড় গুনাহ হওয়ার সাথে সাথে বিলম্ব না করে দ্রুত তাওবাহ্ করা ওয়াজিব। কারণ, তাওবাহ্ হল মুক্তি ও নাজাতের সোপান এবং পথ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١﴾ [النُّور : ٣١]

"হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকটে তাওবাহ্ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"। [সূরা আন নূর-৩১]

অত্র আয়াতে তাওবাহকে সফলতার কারণ বলা হয়েছে। অর্থাৎ যারা তাওবাহ্ করে তারাই নাজাত ও মুক্তি পাবে। তাই পরহেযগার ব্যক্তিরা মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা তাওবা করতে থাকেন। খালেস তাওবা মানুষের পাপসমূহ মোচন করে দেয়। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ٨﴾ [التَّحريم : ٨]

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ তাআলার কাছে তওবা কর-আন্তরিক তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। [সূরা আত তাহরীম: ৮]

আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে মুমিনদেরকে এবং

সাধারণভাবে সকল মানুষকে তাওবাহ্ করতে আদেশ দিয়েছেন। এর অর্থ কোন বান্দাই তাওবাহ্ থেকে অমুখাপেক্ষী নয়। তিনি বলেন,

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾ ﴾ [طه : ٨٢]

"আর যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। [সূরা ত্বহা : ৮২]

কাদের জন্য তাওবার দ্বার উন্মুক্ত:

অনেক লোক আছে যারা সকালে কোন অন্যায় কাজ হতে তাওবাহ্ করে আবার বিকালে ঐ কাজে জড়িয়ে পড়ে। এরূপ তাওবাহ আল্লাহর নিকটে গ্রহণীয় হবে না। তাওবার নীতি বলতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾ ﴾ [النِّسَاء : ١٧ - ١٨]

"অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। আর এমন লোকদেন জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকেঃ আমি এখন তাওবা করছি। আর তাওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। [সূরা আন নিসা-১৭-১৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষের মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তার তাওবা কবুল করা হয়। (সুনানে তিরমিযী ১১/৪৪৫)

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

আবূ মুসা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা দিনে খারাপ আমলকারীদের জন্য রাতে তাঁর হাত প্রসারিত করে দেন, যাতে তারা তাওবাহ্ করে। আর রাতে খারাপ আমলকারীদের জন্য তিনি দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করে দেন, যাতে তারা তাওবাহ্ করে। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উঠা পর্যন্ত আল্লাহ্ বান্দাকে তাওবাহ্ করার সুযোগ দিবেন'। (সহীহ্ মুসলিম ১৩/৩২২)

গুণাহ্ যত দিন আমাদের পিছু না ছাড়ছে ততদিন তাওবার আদেশ বলবৎ থাকবে। আর বিলম্ব না করে তৎক্ষণাত তাওবাহ্ করতে হয়। অনেক মানুষ পাপ কাজ করার পরও তাওবাহ্ না করে তার প্রতি আল্লাহর কোন দয়া দেখলে মনে করে আল্লাহ তার গুণাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু তার খেয়াল করা দরকার আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অন্যায় বা খারাপ কাজ করবে তাকে তার বদলা দেওয়া হবে।

সঠিক তাওবার কিছু শর্ত রয়েছে যা নিম্নরূপ :

১। ইখলাস বা একনিষ্ঠতা : আল্লাহকে ভালবেসে, সওয়াবের প্রত্যাশায় এবং আল্লাহর শাস্তির ভয়ে অন্যায় কাজ ত্যাগ করতে হবে। দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যে গুণাহের কাজ ত্যাগ করলে সওয়াব হবে না। যেমনঃ কোন ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে নয় বরং ক্যান্সার বা অসুখ থেকে বাঁচর জন্য ধূমপান ত্যাগ করে।

২। তাওবাকারী যে অন্যায়ে জড়িত ছিল তা

সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা। তাওবার পরেও কেউ ঐ পাপ করলে ধরে নিতে হবে তার তাওবা সহীহ হয়নি।

৩। পাপের স্বীকারোক্তি করা। কারণ, কেউ কোন গুনাহকে অন্যায় মনে না করলে তার দ্বারা তাওবাহ্ করা সম্ভব নয়।

৪। পূর্বে কৃত গুনাহ ও পাপের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা করা।

৫। ভবিষ্যতে উক্ত অন্যায় কাজ করবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

৬। কৃত অন্যায় যদি কোন ব্যক্তি বিশেষের হক্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তবে তা ফিরিয়ে দেয়া।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যদি কেউ কারও সম্মানহানী করে থাকে বা সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে থাকে তবে কোন টাকা-পয়সা না থাকার আগে (অর্থাৎ, মৃত্যুর আগে) আজই যেন সে ঐ সমস্যা মিটিয়ে নেয়। কেউ কারও প্রতি যুলুম করে থাকলে কিয়ামতের দিন ঐ পরিমাণ তার নেকী মযলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে। আর যালিমের নেকী না থাকলে মাযলুমের গুণাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।' (বুখারী)

৭। তাওবার সময় থাকতে তাওবা করতে হবে। মৃত্যু ও সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উঠার পূর্বেই তাওবা করতে হবে। মৃত্যু উপস্থিত কালে কেউ তাওবা করলে তার তাওবা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না। অনুরূপ কিয়ামতের অন্যতম আলামত পশ্চিম দিগন্তে সূর্য উঠার পূর্বে যদি কেউ তাওবা না করে থাকে তবে পশ্চিমে সূর্য উদিত হওয়ার পরে তাওবা তার কোন উপকারে আসবে না।

তাওবা কবুলের আলামত ঃ

ক) তাওবার পর আগের থেকে ভাল হয়ে যাওয়া।

খ) পূর্বের গুনাহে পতিত হওয়ার ভয় করা।

গ) নিজের কৃত অন্যায়কে খুব বড় মনে করা। যদিও তা হতে তাওবা করে থাকে।

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, মুমিন ব্যক্তি তার পাপকে পাহাড় সমপরিমাণ মনে করে, সেগুলো তার উপর ধ্বংসে পড়ার ভয় করে। অপর দিকে পাপী ব্যক্তি তার পাপকে ঐ মাছি পরিমাণ মনে করে যা নাকে বসে এবং তা সহজেই তাড়িয়ে দেয়া হয়।

কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন,

পাপ ছোট এটা তুমি দেখো না, বরং দেখ তুমি কার অবাধ্য হচ্ছ।

ঘ) তাওবার পর ঐ ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট খুব ছোট মনে করবে এবং বিনয়ী হবে। সব সময় আল্লাহর যিকির করবে এবং তার মাঝে কোন ধোঁকা ও অহংকার থাকবে না।

পরিশেষে: এটা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, তাওবার মাধ্যমে পূর্বকৃত পাপরাশি মোচনের সুযোগ থাকা মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। তাই স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যহ সত্তরের অধিক অপর বর্ণনা মতে একশত বার করে ইস্তিগফার বা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। অথচ তার আগের ও পরের সকল গুণাহসমূহ মোচন করে দেওয়া হয়েছিল।

পাপের সাগরে নিমজ্জিত হয়েও আমাদের অনেকের একবার তাওবা করার চিন্তা হয় না। নিশ্চয় এটা সেই গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দেয়া, যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। অতএব, আসুন আমরা সকল প্রকার পাপ কর্ম পরিত্যাগ করে আমাদের পক্ষ থেকে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মহান আল্লাহর নিকটে বেশী বেশী তাওবাহ করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলের সকল পাপরাশিকে মোচন করে দিয়ে আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব কর। মৃত্যুর পূর্বে তুমি আমাদেরকে খালেস ও খাঁটি তাওবাহ্ করার সুযোগ করে দিও। আল্লাহুম্মা আমীন।











যমযম ম্যাগাজিন (পিডিএফ)।



ইসলাম হাউস ওয়েবসাইট।



মুসলিম শিশুদের যা জানতেই হবে।



শেষ তিন পাড়ার তাফসীর।

اللغة البنغالية